তেমনি শ্রদ্ধাতে আমা অপেক্ষা উচ্চতর একটী আত্মাও উহ্য থাকে। নিম্নশ্রেণীস্থ পশুপক্ষী যতই কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখাক, তাহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কথাই আসে না। আমা অপেক্ষা বয়সে বা জ্ঞানে বা কোন বিষয়ে ছোট যে মানুষ, তাহারও প্রতি শ্রদ্ধার কথা উঠিতেই পারে না। আমার সহিত সমতুল্য মানবের প্রতি ভালবাসা হইতে পারে, স্নেহ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধার কথা আসিতে পারে না। আমা অপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চতর যে আত্মা, তাঁহারই প্রতি আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করা সম্ভব। এই বিষয়ে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সমধর্ম্মী। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীর প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে, অন্যান্য গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে; জ্ঞানে ধর্ম্মে, কর্ম্মে প্রীতিতে আমা অপেক্ষা উন্নততর যে কোন ব্যক্তির প্রতিই আমার শ্রদ্ধা যাইতে পারে।

১০। পরমপুরুষে শ্রদ্ধা।

কিন্তু মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্পিত হইবে, সে শ্রদ্ধা চরম শ্রদ্ধা নহে, তাহা আপেক্ষিক শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার ফলে আমরা পরম শান্তিলাভের অধিকারী হইতে পারি না। একমাত্র সেই পরম পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার ফলেই আমরা প্রকৃত জ্ঞান এবং পরম শান্তি লাভ করিতে পারি। একমাত্র সেই অনন্ত পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার উপলক্ষ করিয়াই গীতাকার বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্‌ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি" ॥

১১। শ্রদ্ধা জ্ঞানলাভের কারণ কেন?

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞানলাভের কারণ কেন? ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করিতে গেলেই তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহাকে জানিতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিদ্যাই যথাসম্ভব অধিগত করিতে হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে সত্য সত্য সর্ব্বতোভাবে জানিতে গেলে অনন্ত দিক দিয়া, অনন্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়া জানিতে হয়। এক কথায়, আমাদিগকে একএকটী অনন্ত পুরুষ হইতে হয়, নচেৎ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিব না। কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নয়—তবে কি তাঁকে জানিতেই পারিব না? তাহা নয়। ভগবান তাঁহার অপার করুণায় এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ তাঁহাকে অনেক দিক দিয়া জানিতে পারে। তাঁহাকে জানিতে গেলে শারীর, মানস ও অধ্যাত্ম সত্যনিয়মসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জানাই সহজ হয়, এবং এই কারণে তাহাকে জানিতে গেলে যত প্রকার সম্ভব তত প্রকারই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়। তাই ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন। তাঁহাকে জানার শেষ নাই। যতই দেখিবে, ততই দেখিতে পাইবে তাঁহাকে জানিবার বিষয় সম্মুখে বিস্তৃতভাবে পড়িয়া আছে।

১২। ঈশ্বরে শ্রদ্ধার চরিতার্থতা।

জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিব, তাহা নহে। আমাদের কর্ত্তব্যই এই যে আমাদের সকল জ্ঞানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানিয়া, তাঁহাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা পাতা ও নির্ব্বহিতারূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করি। কেবল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে আমাদের শ্রদ্ধা কখনও চরিতার্থ হইবে না। আমরা সেই বিশ্বাত্মার মহাগ্নি হইতে বিনিঃসৃত একএকটী বিস্ফুলিঙ্গ। আমরা সেই অনন্তপুরুষ পরমাত্মার সন্তান, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অর্পিত হইলে তবেই তাহা চরিতার্থতা লাভ করিবে। আমাদের যিনি পরম পিতা, তাঁহার নামগানে তাঁহার স্বরূপচিন্তনে, তাঁহার কার্য্যকলাপের আলোচনাতেই সমুদয় বিজ্ঞান, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় দর্শন চরিতার্থ হয়। সেই মহান্ পুরুষের ধ্যানে হৃদয় যে কি পর্য্যন্ত উন্নত হয়, তাহা স্বয়ং না প্রত্যক্ষ করিলে কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না।

১৩। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ফল।

সেই অনন্ত পুরুষ এতই মহান্, যে তদ্‌বিষয়ক চিন্তা তাঁহার অনন্তত্বের তলে হারাইয়া যায়। তিনি এত গভীর যে তাঁহার অনন্তস্বরূপের চিন্তায় আমাদের সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। যখন এই পৃথিবীর বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আয়ত্ত করি, তখন আমাদের নিজের ক্ষমতার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে এবং নিজের বিদ্যাগর্ব্বে মত্ত হই। কিন্তু যখন ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে যাই, তখন তাহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়া, শত দূরদৃষ্টির ফলেও তাহার শিখরদেশ দেখিতে না পাইয়া আমরা প্রতিনিবৃত্ত হই; তখন আমাদের সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় অন্য কিছুই মানুষকে এত বিনয়নম্র করিতে পারে না। "অন্ত কোথা তাঁর, এই কথা সবে জিজ্ঞাসে হে।" ব্রহ্মবিদ্যা অন্তরে শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়। ব্রহ্মবিদ্যা কেবল বিনয় আনে না, আমাদের অন্তরকে কি আশ্চর্য্যরূপে প্রসারিত করে, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিলে মানুষের মন উদার ও প্রসারিত না হইয়া যাইতে পারে না। প্রাণীতত্ত্ববিৎ কীটপতঙ্গকে যথাযথ অস্ত্রপ্রয়োগে বিভক্ত করিতে পারেন, ভূতত্ত্ববিৎ পুরাকালের প্রকাণ্ড প্রাণীসমূহের উপর অনেক বক্তৃতা দিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ বিজ্ঞান মনকে উদার ও বিস্তৃত করে—আংশিক পরিমাণে ইহা সত্য বটে। কিন্তু

ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনার ন্যায় অন্য কিছুই জ্ঞানকে বিস্তৃত করিতে পারে না, মানুষের আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে পারে না।

১৪। শ্রদ্ধাতেই পরম শান্তি।

ব্রহ্মবিদ্যা কেবল জ্ঞানকে বিস্তৃত করে না, কিন্তু পরম শান্তি প্রদান করে। ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্রে যিনি, সেই পরমাত্মাকে অন্তরে চিন্তা কর, সকল ব্যথা দূর হইবে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই এক প্রশ্ন মানবের অন্তরে সমুত্থিত হইতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? যে জগতের সীমা আমাদের কল্পনাতেও আসিতে পারে না, সেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রথম বিন্দু হইতে শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত একটি মহান্ কাতর-ধ্বনি অহরহঃ উদিত হইতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতাকে আমাদের হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিব? মানব যখন অবধি অভিব্যক্ত হইল, তখন অবধিই জগতের সেই প্রাণের কথা হৃদয়ের প্রশ্নটী ব্যক্ত আকারে পরিস্ফুট হইতে চাহিতেছিল। অবশেষে বারিবিন্দুসকল যেমন মেঘের আকারে জমাট বাঁধিতে বাঁধিতে যখন আর ভিতরে ধরিয়া রাখিতে পারে না, তখন বারিধারায় নামিয়া জগতের বক্ষ শীতল করিয়া দেয়; তেমনি মানবের অন্তরে ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন জমাট আকার ধারণ করে, তখনই ইহা শ্রদ্ধার আকার ধারণ করিয়া ভগবানের চরণে নামিয়া আসে এবং তাহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া জগতসংসারে শান্তিধারা ঢালিয়া দেয় ও তাহাকে সুকোমল করিয়া তোলে। এই শ্রদ্ধার ভিতরেই আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি পরিসমাপ্ত হয় ও চরিতার্থতা লাভ করে।

সংসার ও ধর্ম্ম।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন যে "সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ কর, অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই সহজে লাভ করিবে।" অর্থাৎ হৃদয়-মনের সমগ্র শক্তি দিয়া ধর্ম্মের অনুসরণ কর; সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার অভাব হইবে না, ঈশ্বর তাহা তোমাকে দিবেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে "কল্যকার জন্য ভাবিও না, যে ঈশ্বর পাখীদের আহার দেন তিনি তোমারও জীবনরক্ষা করিবেন"—কিন্তু বর্ত্তমান কালে সভ্য সমাজে স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে কাহারও বড় উৎকণ্ঠা দেখা যায় না। লোকে সংসার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত এবং ধর্ম্মকে জীবন হইতে এক প্রকার নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

কোন একটা বড় সহরে যাও, দেখিবে রাজপথে ও ষ্টীমার ঘাটে, রেলের ষ্টেশনে, ও কলকারখানায় কি মহা কল্লোল, কি বিপুল ব্যস্ততা, কি উদ্দাম কর্ম্মস্রোত! হয় ত তোমার মনে হইবে যে এ যুগে জীবনসংগ্রাম এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দেহমনের সমুদয় শক্তি সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রয়োগ করাই প্রয়োজন। হয় ত তোমার মনে হইবে যে যীশুর কথা ভক্তির অত্যুক্তি মাত্র, বর্ত্তমান কালের উপযোগী নহে, এখনকার দিনে উহার অনুসরণ অসম্ভব; আপনাপন অভাবমোচনের চেষ্টা না করিলে ভগবান কখনই অলৌকিক উপায়ে অলসকে অন্নবস্ত্র দান করিবেন না। এই উপদেশ অনুসরণ করিলে অচিরেই আমাদিগকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সপরিবারে পথে দাঁড়াইতে হইবে। অধিকাংশ লোকই মনে করে যে ভাতকাপড়ের শুধু সাংসারিক অভাব মোচন নয় কিন্তু সর্ব্ববিধ ভোগবিলাসের ব্যবস্থাটা আগে করা উচিত। তার উপরে যদি ধর্ম্ম হয় ত ভালই, আর যদি নাই হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল জানিয়া শান্ত ও সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানধারণার জন্য লোকালয় হইতে দূরে—অরণ্যে, গিরিগুহায় বা মঠে আশ্রয় লইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রবৃত্তির ভয়ে বিকম্পিত। তাঁহারা জীবনের সকল বাসনা ও কামনাকে বিসর্জ্জন দিয়া, সকল স্নেহমমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পরিবার বন্ধুবান্ধব সমাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যা ও আত্মনিগ্রহের দ্বারা হৃদয় হইতে সকলপ্রকার প্রবৃত্তিকে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার আত্মঘাত। এরূপ সন্ন্যাসীর জীবন কিছুতেই মানবের পূর্ণতার আদর্শ নহে। ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁহারা মানুষকে কঠোরভাবে পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে স্বর্গে অবিশ্রান্ত পূজাবন্দনাই চলিতেছে। স্বর্গের কল্পনা হইতে তাঁহারা সকল প্রকার জ্ঞানচর্চ্চা ও কাজকর্ম্ম মুছিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু নিজের পরিত্রাণের জন্য যদি আমরা লোকালয় হইতে পলাইয়া যাই, তবে ত আমাদের দীন দুঃখী ভাইভগিনীর জন্য কিছু করার সম্ভাবনাও থাকে না।

একদল লোক বলিতেছেন যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে আর ধর্ম্মসাধন চলে না; আর এক দল লোক বলিতেছেন ধর্ম্মসাধন করিতে গেলে আর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। প্রথম শ্রেণীর লোক যেমন সংসারকে সার ভাবিয়া ধর্ম্মকে জীবন হইতে বিদায় করিয়া

দেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক তেমনি ধর্ম্মকেই সত্য এবং সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল জানিয়া সংসার হইতে দূরে পলায়ন করেন। উভয়েই সংসার ও ধর্ম্মের মিলনকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু একথা কি সত্য যে সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মসাধন অসম্ভব? এ কথা কি সত্য যে, সংসার ধর্ম্মের প্রতিকূল?

আমরা অনেকেই মনে করি যে আহারবিহার আমোদ-প্রমোদ, অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রী-পুত্রপ্রতিপালন, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের অনুশীলন, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন—এগুলি জীবনের সাংসারিক দিক; আর ধ্যানধারণা, পূজাঅর্চ্চনা, সঙ্গীতসংকীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠ—এইগুলিই ধর্ম্মসাধন। এই সকল সাধন হইতে যাহা কিছু আমাদিগকে বিচ্যুত করে আমরা তাহাকেই ধর্ম্মের অন্তরায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা বশতঃ অনেক ভাল লোকও মনে করেন যে, সংসারযাত্রায় মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ভিন্ন গতি নাই।

কিন্তু বাস্তবিক সংসার শয়তানের রঙ্গভূমি নয় কিন্তু ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মানবের কর্ম্মক্ষেত্র। সংসার কতকগুলি কাজকর্ম্মের সমষ্টি নয়, এবং ধর্ম্মও অন্যপ্রকারের কতকগুলি কাজকর্ম্মের সমষ্টি নয়। ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে কোন বিরোধ নাই এবং কোন কর্ম্মবিভাগও নাই। যখন একজন সংসারী লোক ধর্ম্মজীবন লাভ করেন, তখন তাঁহার বাহ্যিক কাজকর্ম্মের বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না; পূর্ব্বেও তিনি যাহা যাহা করিতেন পরেও তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু একটা মহা পরিবর্ত্তন আসে তাঁহার হৃদয়ে একটা দেবভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। যে কাজগুলিকে আমরা সচরাচর সংসারের কাজ বলি, তাহার মধ্যেই তিনি ধর্ম্মসাধনের সুযোগ দর্শন করেন। তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহেই বাস করিতে পারেন, ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মানুষকে সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখিয়া বিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করেন, লোকের সহিত ব্যবহারে চতুরতা পরিত্যাগ করিয়া সত্য এবং সরলতা অবলম্বন করেন এবং পাছে অন্য কেহ তাঁহাকে ঠকায় এই উদ্বেগের পরিবর্ত্তে তিনি যেন অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করেন—তাঁহার এই চিন্তাই প্রবল হয়। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাহারই মূলে কুটিলতা স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনাও থাকিতে পারে, আবার সদ্ভাব ন্যায়পরতা ও সরলতাও থাকিতে পারে। একই কাজ এক ভাবে করিলে আমরা কলুষিত হই, এবং অন্য ভাবে করিলে তাহাতে আমাদের পুণ্য লাভ হয়। ধর্ম্ম ও সংসারের মূলে এই ভাবের ভিন্নতা।

মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে—এইগুলিই কর্ম্মের উৎস। এইগুলি সংখ্যায় পাপী ও সাধুর সমান। পাপীর যে এমন কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি আছে যাহা সাধুর নাই, কিম্বা সাধুর যে এমন কতকগুলি সুপ্রবৃত্তি আছে যাহা হইতে পাপী বঞ্চিত, এরূপ নহে। আমাদের বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দেয়, কোন্ কোন প্রবৃত্তি ভাল আর কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি মন্দ। বিবেকের মূল অর্থ বিবেচনা ও বিচার। আমরা অনেক সময়ে বিবেকের প্রেরণার কথা বলি বটে কিন্তু ইহা ভুল, ইহা ভাষার অপব্যবহার। বিবেক নিজে একটী প্রবৃত্তি নয়, কিন্তু ইহা একটী স্বর্গীয় আলোক; এই আলোকেই আমরা দেখি যে ভোগবিলাস অপেক্ষা সেবা শ্রেষ্ঠ, প্রবঞ্চনা অপেক্ষা সত্যরক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিহিংসার বহু ঊর্দ্ধে ক্ষমার স্বর্ণ সিংহাসন। অনেকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পশুপক্ষী ও মানবের সমান। কিন্তু ইতর প্রাণীরা প্রবৃত্তির অন্ধ দাস, মানুষ প্রবৃত্তির চক্ষুষ্মান্ প্রভু। কেবল মানুষেরই আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষা করিবার শক্তি আছে। প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী ভাল আর কোন্ কোন্টীই বা মন্দ, একমাত্র মানুষই তাহার বিচার করিতে সমর্থ। যখন জীবনের এক একটী সন্ধিস্থলে একটী ভাল প্রবৃত্তি এবং একটী মন্দ প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে এক-সঙ্গে উপস্থিত হয়, তখন মন্দটীকে পরিহারপূর্ব্বক ভালটীর অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা একমাত্র মানুষেরই আছে। যদি প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে ভালমন্দ না থাকিত, কিংবা যদি মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা না থাকিত তবে বিবেকের প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত তাহারা ভালকে ভাল জানিয়াও তাহার অনুসরণ করিতে পারে না, এবং মন্দকে মন্দ জানিয়াও তাহার অনুসরণ হইতে বিরত হইতে পারে না। হয়ত দীর্ঘকাল পাপের দাসত্ব করিয়া তাহারা নৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছে। এখানে বিবেকের সঙ্গে ইচ্ছার বিরোধ। এ অবস্থা আমরা সকলেই জানি। যখন বিবেকের আলোকে ভালমন্দ দেখিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাল যাহা তাহাই গ্রহণ করি, তখনই আমরা ধর্ম্মকে বরণ করি। এক কথায় ধর্ম্মের অর্থ বিবেক ও ইচ্ছার সম্মিলন।

তবে সংসার ও ধর্ম্মে প্রভেদ কোথায়? যে ব্যক্তির কাছে সুখস্বচ্ছন্দতার চিন্তাই সকলের উপরে, এবং তাহার জন্ম অসদুপায় অবলম্বন করিতে যাঁহার

আপত্তি নাই, তিনিই সংসারী; আর যিনি কোন অবস্থাতেই স্থায় ও সত্য লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহেন, তিনিই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহার ধ্যান-জ্ঞান চিন্তা উৎসাহ উদ্যম অধ্যবসায় কেবল সম্ভোগের দিকে, যিনি নানা উপায়ে প্রবৃত্তির আগুনে আহুতি দিয়া কামনা ও বাসনাকে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করেন তিনিই সংসারী; আর যিনি বিবেকের আলোকে প্রবৃত্তিগুলিকে দেখিয়া পশুপ্রবৃত্তিগুলিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বন্ধনে বশীভূত করিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি যে তিনিই ধর্ম্মকে বরণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত না করিলে সন্ন্যাসীর শান্তি নাই, কিন্তু যিনি ধর্ম্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন ও উৎকট পন্থা পরিহার পূর্ব্বক সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কোনও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ভয় বা অবিশ্বাস করেন না। মানবহৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলির বিকাশই তাঁহার লক্ষ্য।

যাঁহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে সুচতুর তাঁহারা বলেন যে "হাঁ, যীশুর উপদেশ বড় সুন্দর বটে কিন্তু উহা কাজের কথা নয়, উহা জীবনে পালন করা অসম্ভব। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিলে চলে না।" কিন্তু যে উপদেশ পালন করা অসম্ভব, তাহাকে সুন্দর বলাও উচিত নহে। অধ্যাত্ম জগতে সত্য ও সুন্দর এক—যাহা সুন্দর তাহাই সত্য। বহির্জ্জগতে যেমন আলোকের অভাবে সৌন্দর্য্য অসম্ভব অন্তর্জ্জগতে তেমনি সত্যের অভাবে সৌন্দর্য্য অসম্ভব। যে উপদেশ আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝিব, তাহা আমরা পালন করিতে বাধ্য; যে আদর্শের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইব আমাদিগকে সে আদর্শের অনুসরণ করিতেই হইবে। একটী চিত্র দেখিয়া আমরা বলিতে পারি "আহা বেশ ত! আহা বড় সুন্দর!"—উহার ঐখানেই শেষ। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি বাধ্যতামূলক—"ক্ষমা, বড় সুন্দর, ক্ষমা বড় চমৎকার গুণ" একথা বলিলেই তাহা ফুরায় না—যাহা সুন্দর বলিয়া আমরা বুঝিব, তাহা জীবনে আমাদিগকে পালন করিতেই হইবে। হৃদয় যদি বলে কথাটী বেশ, কিন্তু বুদ্ধি যদি সঙ্গে সঙ্গে বলে উহা কাজের কথা নয়, তখন যেন আমরা বুদ্ধির প্রতিবাদকে তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ের বাণীকেই মস্তকে বরণ করি।

যীশু যে ভগবানের উপরে নির্ভর করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ত আলস্য অবলম্বন নহে—একেবারেই নহে। তিনি যে পাখীদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহারা কি অলস? তাহারা কি আহার অন্বেষণ করে না? করেই ত! নিশ্চয়ই করে! তাহারা কি শাবকদের জন্য তৃণপত্র দিয়া যথাকালে বাসা নির্ম্মাণ করে না? করেই ত! নিশ্চয়ই করে! তাহারা যে মানুষের আলস্যশিক্ষার গুরু, একথা কখনই বলা যায় না। ভগবানই তাহাদিগের অভাব-মোচনের জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি নিজ হস্তে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, চেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা উহাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়। তবে তাহারা কিসে মানুষের পক্ষে নির্ভরশীলতার আদর্শ হইল? তাহারা যাহা করে তাহাতে যদি কোন দোষ না হয়, তবে মানুষ সেই কর্ম্ম করিলে এত দোষের হইবে কেন?

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে মানুষ এবং ইতর প্রাণীরা যে আপন আপন অভাবমোচনের চেষ্টা করে এই দুই চেষ্টার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। মানুষের চেষ্টা বুদ্ধিমূলক, উহাদের চেষ্টা সংস্কারপ্রসূত। হাঁসের ছানা ডিম হইতে বাহির হইয়াই যে জলের সন্ধানে ধাবিত হয় এবং নদী বা সরোবরে গিয়া সন্তরণ দিতে আরম্ভ করে—এ কাহার ইঙ্গিত? এখানে যখন আমের মুকুল শুকাইয়া যায় তখন কোকিল ঠিক জানে কোথায় কোন্ সুদূরে বসন্ত তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহার না আছে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, না চেনে সে ধ্রুবতারা, অথচ সে সমুদ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে চলিয়া যায়, এবং যথাকালে আবার ঠিক ফিরিয়া আসে—এই বা কাহার ইঙ্গিত? ইতর প্রাণীরা অন্ধ-ভাবে কার্য্যসিদ্ধির নানা অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে, বিনা শিক্ষায় আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে, বিনা সাধনায় বিচিত্র সৌন্দর্য্য রচনা করে।

ইতর প্রাণীরা কেমন স্বভাবতঃ শান্ত ও নিশ্চিন্ত! ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের উৎকণ্ঠা নাই। কোথায় তাহাদের জন্য কি সঞ্চিত আছে অতি আশ্চর্য্যরূপে উহারা তাহার সন্ধান পায় এবং ঠিক সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। ইহা এক আশ্চর্য্য কৌশল, কিন্তু যেখানে কৌশল তাহারই পশ্চাতে জ্ঞান। পশুপক্ষীরা ত অন্ধভাবে ও অজ্ঞাতসারে কাজ করে, সুতরাং বলিতে হয় যে তাহাদের জীবনযাত্রার পশ্চাতে যে কৌশল সে কৌশল ঈশ্বরের। তাহাদের জীবন ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত একথা না বলিয়া আর কি বলিব? ভগবান স্বহস্তে তাহাদের জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই অদ্ভুত রহস্যের কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিক বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

জীবনরক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, পশুপক্ষীরা তাহা বিধাতার হস্ত হইতে লাভ করে বটে, কিন্তু তাহারা এই প্রয়োজনকে কখনও অতিক্রম করে না। তাহারা স্বভাবতঃ সংযত ও মিতাচারী। ভোগে তাহাদের

আতিশয্য নাই। মানুষকে প্রতিজ্ঞার বাধন দিয়া বাসনাকে খর্ব্ব করিতে হয়, সাধনের দ্বারা ভোগের লালসাকে দমন করিতে হয়। ইতর প্রাণীরা স্বভাবের নিকট যে সংযম শিক্ষা করে, মানুষকে বিবেকের আলোকে সেই সংযম অভ্যাস করিতে হয়। আমরা যদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে পারি, তাহা হইলে যে প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে পশুপক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে, সেই দেবভাবগুলির অবাধ বিকাশের সুবিধা হয়। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান সভ্যসমাজে সংযম কোথা? মানবের ভোগতৃষ্ণার অন্ত কোথা? বাসনাকামনার নিবৃত্তির চেষ্টা দূরে থাকুক, ভোগবিলাসই অধিকাংশ লোকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। ভোগের লালসা মানুষের স্বভাবতই প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ লোক হৃদয়-মনের সমুদয় শক্তি দিয়া সেই প্রবল লালসাকে আরও উদ্দীপ্ত করিতেই চেষ্টা করে।

বিবেক যে আমাদিগকে শুধু সংযম শিক্ষা দেয় তাহা নহে, কিন্তু বিবেকের অনুসরণ করিলে জীবনরক্ষার্থ আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্য আমাদের উদ্বেগও কমিয়া যায়। এ কথাটা শুনিলে সহসা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কারণ পশুপক্ষীরা সংস্কারের প্রেরণায় অন্ধভাবে এবং অজ্ঞাতসারে কাজ করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাহারই পশ্চাতে চিন্তা থাকে। মানুষের পক্ষে কোন কাজই অন্ধভাবে এবং অজ্ঞাতসারে করা সম্ভব নহে। এ কথা সত্য, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কি শারীরিক কি মানসিক যে সকল কাজ করিতে প্রথম প্রথম বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম লাগে, অভ্যাসবশতঃ সেরূপ সকল কাজই ক্রমে সহজ হইয়া যায়। এক কথায় বলা যাইতে প্যারে যে পশুপক্ষীরা প্রকৃতির নিকট হইতে যে সংযম ও নিশ্চিন্তভাব লইয়া জীবন আরম্ভ করে, মানুষকে অভ্যাসের দ্বারা সেইরূপ সংযম ও নিশ্চিন্তভাব অর্জ্জন করিতে হয়।

কিন্তু অভ্যাস মানুষকে ধর্ম্ম দিতে পারে না। কারণ অভ্যাস স্থিতিশীল আর ধর্ম্ম গতিশীল। অভ্যাস পুরাতন লইয়া থাকে, আর ধর্ম্মের লক্ষ্য চির উন্নতি, ধর্ম্মের লক্ষ্য নিত্য নব প্রেমভক্তি, নিত্য নব প্রতিজ্ঞা, নিত্য নব সংগ্রাম। অভ্যাস মানুষকে নীচ বাসনা ও কামনা জয় করিবার বল দিতে পারে বটে এবং খানিকটা উচ্চ ভূমিতে লইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে সংগ্রামের অবসান হয় না। ভগবান স্বহস্তে মানবের ললাটে অনন্তের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের নিয়তি। সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত আমাদিগকে ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে। অনন্তের তীর্থপথে আমরা চিরযাত্রী। এ পথে নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, বিশ্রাম নাই, অবসাদ নাই—অথচ এই যাত্রায় কি আনন্দ, কত সুখ, কি বিপুল মত্ততা!

ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবনের উপায়।

(স্বামী সদানন্দ)

ব্রাহ্মসমাজকে সবল ও সতেজ করিবার জন্য আমাদিগের প্রচারকার্য্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ, ব্রাহ্মসমাজের উদার ভাব ও নীতি, সুলভ সংবাদ পত্র ও পুস্তিকাদি দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিয়া বহুলপরিমাণে দেশের নানাস্থানে বিতরণ করা আবশ্যক। পূর্ব্বে খৃষ্টান মিসনরিগণ এইরূপে তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে সকল সমাজের সহায়তার প্রয়োজন।

এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একখানি ইংরাজি ও একখানি বাংলা, নববিধান সমাজের একখানি ইংরাজী ও একখানি বাংলা পত্র, বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের একখানি ইংরাজী ও মহারাষ্ট্র ভাষার পত্রিকা, অন্ধ্রদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী ও তেলেগু ভাষার পত্র এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজের একখানি বাংলা পত্রিকা এবং যুক্তপ্রদেশের ইংরাজী পত্রিকা মেসেজ—এই কয়েকখানি পত্রিকার বিষয় আমরা অবগত আছি। কিন্তু এই সকল পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা এত অল্প যে, তাহা দ্বারা আমাদের ইচ্ছানুরূপ ফললাভ সম্ভবপর নহে। তদ্ভিন্ন, এই সকল পত্রিকার মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র সমাজের সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা যে অন্ততঃ এক-লক্ষ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলি বিতরিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাবান লেখক দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করাইয়া নানাভাষায় অনূদিত করিয়া স্থানীয় সমাজগুলির সাহায্যে নানাদেশে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা যাইতে পারে। ইহাতে খরচ অনেক কম পড়িবে। এইরূপ প্রচারকার্য্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানার আবশ্যক। পুস্তিকাগুলির জন্য প্লেট করাইয়া রাখিলেও ভাল হয়। কারণ তাহা

হইলে অল্প অল্প করিয়া মধ্যে মধ্যে ছাপাইয়া বিলি করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মপরিচালিত একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক পত্রিকা ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র আছে। দুই-একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের মত, বিশ্বাস ও নীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বিলাতে ও আমেরিকায় এই-রূপ বন্দোবস্ত দ্বারা অনেক সোসাইটি আপনাদের প্রচারকার্য্য করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মসাধারণের উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে আমি এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিতে পারি, এবং কিছুদিনের জন্য ইহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি। ব্রাহ্ম-সমাজের অর্থাভাব বশতঃ কোন শাখা এই গুরুভার বহন করিতে ইচ্ছুক হইবেন না, তাহা জানি। সেই-জন্য ইহার একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রথমে অল্পমাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্র বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ রাজনীতির বহির্ভূত হইলেও দেশের অনেক মঙ্গলময় কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহাদের উদীয়মান স্বদেশপ্রেমে বাধা না দিয়া তাহাদিগকে নীতিবন্ধনের বহির্ভূত হইতে না দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। আমাদিগকে এই ছেলেদের মধ্যে ছেলে হইয়া, তাহাদিগকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

দরিদ্রদিগের সেবা জগতের একটি মহৎ কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজই এই কার্য্যে প্রথমে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই আমাদের সেই উৎসাহ লোপপ্রাপ্ত হয়। আমাদের এই দৈন্যদশা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নিজ হস্তে এই কার্য্য গ্রহণ করেন। "রামকৃষ্ণ-মিশনের" প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রধান কারণ। আমরা যদি ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইতাম, তাহা হইলে এই সফলতা আমরাই লাভ করিতে পারিতাম।

অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধারকার্য্যের জন্য আজ সকল সম্প্রদায়ই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজই এই অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধারকার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথমে ব্রতী হন। কিন্তু এখন আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছি। ইহা কাহার দোষ? আমি যখন প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতাম, সে সময়ে প্রতি রবিবারে অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচার করিতে যাইতাম। তাহাদের সহিত এক চাটাইয়ে বসিয়া ভজন করিতাম ও উপদেশ দিতাম। প্রথম প্রথম অনেকেই এজন্য আমাকে তিরস্কার করিতেন এবং আমার নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ না হইয়া আরও প্রবল উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতাম। অবশেষে সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশমিত হইয়া যায় এবং এই সকল অস্পৃশ্যজাতীয় ভ্রাতাগণ আমাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অনেক দিন পরে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুত সিন্ধে Depressed Class Mission স্থাপন করেন। কিন্তু এ কার্য্যে তিনি ব্রাহ্মেতর জাতির নিকট হইতেই অধিক সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধারবারে অবস্থানকালে আমি তথায় একটি শাখা Depresed Class Mission খুলি। আমাদের দুইটি দিবা ও একটি নৈশ-বিদ্যালয় ছিল। আমাদের কার্য্য ক্রমে এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল যে, তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা এই সকল অস্পৃশ্য জাতিকে ফটকের ভিতর আসিতে দিতেন না, তাহাদিগকে নিজ বৈঠকখানায় আনিয়া একত্র বসিতে দিতেন।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধেও ব্রাহ্মসমাজ সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমরা উৎসাহ ও উদ্যমে অপর সম্প্রদায়ের নিকট পরাজিত হইয়াছি। ইহার কারণ কি? আমার বিবেচনায় আমাদের ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, অর্থ ব্যয় করিতে কৃপণতাই ইহার একমাত্র কারণ। একজন সামান্য হিন্দু বিবাহ, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখি, বড় বড় ব্রাহ্ম অগাধ পয়সার উপরে বসিয়াও সমাজের জন্য এক টাকা হইতে দশ টাকার মধ্যে, অতি কাতরে, সমাজকে দান করিয়া থাকেন। ইহা যখন আমাদের সমাজ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন আমি বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হই। আমি নানা দেশের ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিয়া এই কৃপণতার অথবা স্বার্থপরতার যে সকল আদর্শ দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া সমাজের হিতসাধন হইতে পারে? যতদিন না আমরা এই কৃপণতার হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইব, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আবৃত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দেশে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। আজ আর লোকে শুধু কথায় ভুলে না। এখন চাই কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। যে সম্প্র-দায় এখন অধিক দেশ ও সমাজহিতকর কার্য্য করিতে পারিবে, সেই সম্প্রদায়ই দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারিবে। এখন চাই মিলন; স্বতন্ত্রতার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই প্রেম; দ্বন্দ্বের দিন আর নাই। বোদের

ব্রাহ্মসমাজ প্রেমের দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিবে, যেদিন ব্রাহ্মসমাজ ভ্রাতৃপ্রেমে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত করিতে পারিবে, সকল সমাজের আদর্শকে যেদিন ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ অতিক্রম করিয়া উঠিবে, সেইদিনই ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থান সম্ভব হইবে, সেই-দিনই ব্রাহ্মসমাজের জয়পতাকা জগতের উচ্চতম শিখরে উড্ডীয়মান হইতে পারিবে। ইহা স্বপ্নের কথা নয়। জাজ্বল্যমান সত্য। প্রকৃত ব্রাহ্মগণ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি আজীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি।

এজন্য ব্রাহ্মসমাজের নবশতাব্দীর এই প্রারম্ভভাগে আমি প্রত্যেক ব্রাহ্মভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা এই নবযুগে নবপ্রাণ লইয়া আবার নূতন উৎসাহে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ব্রতী হউন। তাঁহাদের উচ্চ আদর্শের দ্বারা জগতকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুন। যিনি যেখানে আছেন, ব্রাহ্মসমাজের ভেরী নিনাদিত করিয়া চৈতন্যদেবের ন্যায় ভারতের ধূলিকণা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব দ্বারা পুনর্জ্জাগ্রত করিয়া তুলুন। সকল সম্প্রদায়ই এখন ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। একণে ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত তাহাদের পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে যদি ব্রাহ্মসমাজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হন, বা আলস্য করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ অচিরে কালের করাল কবলে পতিত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতচর্চ্চার প্রয়োজন।

(ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী ডি. মিউজ)

১। সঙ্গীতশিক্ষার প্রয়োজন।

সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চ্চা করা কেবল শিশুদিগের নহে, কেবল বালকবালিকার নহে, কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা মানবমাত্রেরই পক্ষে আবশ্যক ও উপকারী। সঙ্গীত মানবের চিন্তা ও জ্ঞানকে পরিমার্জ্জিত করে, এবং মানব-সমাজকে সভ্যতা ও উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত করে। সেই কারণেই বোধ হয় সঙ্গীতের উন্নতি সভ্যতার মাপ-কাটি বলিয়া অনেক সময়েই উক্ত হয়। সঙ্গীত মানবের পক্ষে শুধু বাহার দিবার বস্তু বা accomplishment মাত্র নহে। ইহা মানবের জীবনযাত্রারও পথে অনেক বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে এবং অনেক সময়ে মানবকে অবসাদের হস্ত হইতে রক্ষা করে।

২। সঙ্গীতের চরম ফল—পরমাত্মায় আত্মার যোগসাধন।

চিত্রকলা বল, ভাস্কর্য্য বল, কাব্য বল, বা সঙ্গীত বল, কলামাত্রেরই ধর্ম্ম হইল, উহার বিশেষত্ব ও উদ্দেশ্য হইল মানবহৃদয়ে আনন্দবিধানের সঙ্গে মানবকে উন্নতিপথে পরিচালিত করা, তাহার জীবনযাত্রার পথে তাহাকে সহায়তা করা। কলামাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বিষয়-সমূহের গণ্ডীমাত্রে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; কিন্তু সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সকলের অতীত ও সকলের অন্তর্য্যামী যে অনন্ত মহান পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমাদের জ্ঞানে ও ধ্যানে ধরিয়া দিতে চায়। আমরাও কলাবিদ্যার সাহায্যে সেই ভূমানন্দকে লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। সকল কলাবিদ্যাই বিশেষতঃ সঙ্গীত, সেই পূর্ণ আনন্দস্বরূপের সহিত আনন্দের ভিতর দিয়া মানবের একাত্মসাধনে অগ্রসর হয়। পর-মাত্মার সহিত আত্মার মিলনসাধনে সঙ্গীতের ন্যায় দ্বিতীয় কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সেই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ যেন বিগলিতধারে নামিয়া আসিয়া আমাদের অন্তরে প্রকাশ পাইতে চায়।

৩। সঙ্গীত সর্ব্বজনীন ভাষা—প্রকাশ প্রণালী বিভিন্নমাত্র।

সঙ্গীত প্রকাশ করিবার প্রণালীর মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও বস্তুত সঙ্গীত বিভিন্ন নহে। বলিতে গেলে সঙ্গীত মানবপ্রাণ হইতে সমুদ্ভুত এক সর্ব্বজনীন ভাষা। জননী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে উক্ত হইলেও জননীত্ব বা মাতৃত্ব যেমন সকল দেশেই এক, সেইরূপ সঙ্গীতের ভাব-ভঙ্গী দেশভেদে বা কালভেদে পৃথক হইলেও উহার মূল-গত একত্ব কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। মানুষ জ্ঞানে ভাবে যতই উন্নত হইবে, সঙ্গীতের প্রকাশপ্রণালী-মাত্র ততই আকারে প্রকারে বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে। কাজেই সঙ্গীতের মূলভাবের ন্যায় ইহার প্রয়োগক্ষেত্রও কোন প্রকার গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

৪। সঙ্গীত ভগবন্নিহিত বৃত্তি।

ভগবান মানবকে বিভিন্ন শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। সে সকল শক্তি ও বৃত্তির অপচয় ও অপ-ব্যবহার করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমাদের

অন্তরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের ইহাই মঙ্গল ইচ্ছা যে, আমরা আমাদের প্রত্যেক শক্তি ও বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করি এবং সেগুলিকে যথাযথ ব্যবহারে নিয়োগ করিয়া আনন্দ উপভোগ করি ও আপনাদিগকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করি। আমাদের সঙ্গীত-বিষয়ক অন্তর্নিহিত শক্তি ও ইচ্ছা সেই সকল ভগবন্নিহিত বিভিন্ন শক্তি ও বৃত্তির অন্যতর।

৫। স্বর ও কর্ণের যোগসাধন।

বীজের সহিত মৃত্তিকার, কর্ণের সহিত শব্দের, এবং চক্ষুর সহিত আলোকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। গাছ জন্মাইতে গেলে শুধু বীজে হইবে না, মৃত্তিকা চাই; ভগবানের বিধানেই বীজকে ভূমিতে প্রোথিত না করিলে তাহা হইতে বৃক্ষও উদ্গত হইবে না, এবং তাহার ফল-ভোগের আশাও দুরাশায় পরিণত হইবে। সেইরূপ সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করা শুধু কর্ণের দ্বারা সম্ভব নহে বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা শুধু চক্ষুর দ্বারা সম্ভব নহে। সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে গেলে সঙ্গীতের সুরগুলির সহিত কর্ণের যোগসাধন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে—সুরগুলি কানের ভিতর দিয়া মনের ভিতর প্রবেশ করা চাই। এই মনের ভিতর প্রবেশ করার সঙ্গে আমাদের কোন কিছু জানা ও অনুভব করার একটা অবিচ্ছেদ্য ও পরস্পরের উপ-যোগী সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

৬। সঙ্গীতবৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজন।

এই সকল আলোচনা করিলে ভগবানের এই অভি-প্রায় আমরা উপলব্ধি করি যে, সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপ-ভোগের জন্য কর্ণের ন্যায় আমাদের মনকেও উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতিকেও জাগ্রত রাখিতে হইবে। মনকে যতই উন্নত করিব এবং জ্ঞান ও অনুভূতিকে যতই জাগ্রত করিতে পারিব, ততই সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতাও আমাদের বর্দ্ধিত হইবে। এই সকল হইতে ভগবানের এই অভি-প্রায় আমাদের অন্তরে সূচিত হয় যে, তিনি আমাদের মনে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি দিয়াছেন, সেগুলিকে যথা-যথ ব্যবহার ও অনুশীলনের দ্বারা সমুন্নত করিয়া তুলি। ভগবান যে সকল নিয়ম জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় সুব্যক্ত হয়। ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিলেই তাহা হইতে সুফল প্রসূত হইবে। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার প্রদত্ত শক্তি ও বৃত্তিসমূহের তাবরূপ যাচ করিলেই তাহা হইতে আমরা সুফল লাভ করিব, উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইব। তাঁহার সমস্ত নিয়মই মানুষকে তাহার শক্তি ও বৃত্তির অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করে।

৭। শব্দ, কর্ণ ও কণ্ঠ মিলনসূত্রে আবদ্ধ।

সঙ্গীতেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ভগবান যেমন কর্ণকে শুনিবার শক্তি দিয়াছেন, তেমনি তিনি আমাদের কণ্ঠকেও বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকারে প্রকারে আমাদের মনের ভাবসমূহকে প্রকাশ করিবার শক্তিসামর্থ্য দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা আমাদের সঙ্গীত করিবার শক্তি ও তাহা উপভোগ করিবার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, তাহারই জন্য যেন শব্দ, কর্ণ ও কণ্ঠ, এ সমুদয়কে এক আশ্চর্য্য ও সুন্দর মিলনের সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহারা যেন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে—একের উৎকর্ষ-সাধনে অপরেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই কারণেই মনে হয়, কর্ণ সুস্বর ধ্বনি হইতে কর্কশ ও বেসুরা ধ্বনির পার্থক্য উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে এবং শ্রুতিমধুর শব্দের ফলে আনন্দ প্রাণে বহন করিবারও বৃত্তি ধারণ করে। এই কারণেই মনে হয়, কণ্ঠ আমা-দের মনের নানাবিধ ভাবসমূহকে নানা আকারে প্রকারে ব্যক্ত করিবার যন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতি-তেও আমরা শতবিধ সুস্বরের উৎপত্তি ও মিলন-মিশ্রণের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের আনন্দসাধনের জন্য ভগবান কত না উপায় বিধান করিয়াছেন, ভাবিয়া অবাক হই। সঙ্গীত করিবার যে শক্তি ও বৃত্তি ভগবান আমাদের অন্তরে দিয়াছেন, অনুশীলনের দ্বারা তাহার উৎকর্ষসাধনে কেবল যে আমরা আনন্দ উপভোগ করিব তাহা নহে, তাহাতে ভগবানেরও দান সার্থক হইবে।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্-এ. পি. আর. এস্)

সে আজ কয়েক বছরের কথা। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয়শ্রেণীতে পড়ি। মহাত্মা গান্ধিপ্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন তখন সারা দেশকে আলোড়িত করিতেছে। বড়দিনের ছুটিতে আমরা ঠিক করিলাম যে, সুন্দরবনে আমাদের কোনও আত্মীয়ের জমীদারীতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে যাইব। প্রত্যেক ছুটীতেই আজকালকার সুপরিচিত স্বাস্থ্যকর-স্থানগুলিতে বার বার যাইয়া, যেন একরকম

অরুচি হইয়া গিয়াছিল। তাই সেবারকার এই অভিনব ভ্রমণের কল্পনায় মন বেশ পুলকিত হইল।

২৫শে ডিসেম্বর, রবিবার রাত্রে আমরা সকলে জিনিস-পত্র গুছাইয়া আর্ম্মেনীয়া ঘাটের দিকে রওনা হইলাম। আমি সঙ্গে লইবার মধ্যে আমার প্রিয় ছটী বাঁশী ও "চয়নিকা" লইয়াছিলাম। আর নামমাত্র একখানা ইকনমিকস্ এর বইও ছিল; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, একদিনের জন্যেও সেখানির সদ্ব্যবহার হয় নাই। আমরা যখন ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম, তখন জাহাজ ষ্টীম দিয়াছে, আমরা উঠিতেই ছাড়িয়া দিল। জাহাজখানি ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া সার্চ্চলাইটের সাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা সবাই ডেকের উপর চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। এত ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল যে, ওভারকোট মুড়ি দিতে বাধ্য হইলাম। দুধারে অন্ধকারের মধ্যে পাটকল ও অন্যান্য অট্টালিকা-শ্রেণীর আলোগুলি অসংখ্য তারার মত আকাশের তলায় ঝিকৃমিক্ করিতেছিল। আরও সুদৃশ্য দেখাইতেছিল, বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত পোতশ্রেণী—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ক্রমে ক্রমে আমরা খিদিরপুর প্রভৃতি ছাড়াইয়া সাগরের দিকে অগ্রসর হইলাম। দূর হইতে সহরের ও কলকারখানার অগণিত আলোর রেখাসমূহ ঘোর তমসাচ্ছন্ন আকাশপ্রান্তে এক জ্যোতির্ম্ময় দ্যুতির রচনা করিতেছিল। ঘনান্ধকার কুহেলিকায় নদীরধারের প্রকাণ্ড বাড়ীগুলির স্তরে স্তরে সাজান আলোকশ্রেণীও গঙ্গাবক্ষে তাহাদের ছায়ার সহিত মিলিয়া এক অপরূপ রূপলোক সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সব দেখিতে দেখিতে চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ সে চিন্তাসাগরে ডুবিয়াছিলাম, জানিনা—হঠাৎ জাগিয়া দেখি তীরের আর কোনও আলোই দেখা দিতেছে না; চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। আর আমাদের জাহাজখানি দ্রুতবেগে সার্চ্চলাইটের সাহায্যে আপনার গন্তব্য অভিমুখে চলিয়াছে। নীচে এঞ্জিনের শব্দ আর খালাসীর গোলমাল শুনা যাইতেছে। আমার সঙ্গীরা ডেক ছাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, আমিই কেবল সেই বুককাঁপান তুষারশীতল পাগলহাওয়ায় বসিয়া আছি। আমার চারিপাশে সব নিদ্রিত—তখন রাত প্রায় বারোটা।

আমি উঠিয়া ভিতরে কেবিনে যাইলাম। কিছু খাইয়া, তার পর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। জাহাজখানি দোতলা এবং প্রকাণ্ড। এতবড় জাহাজে এই আমার প্রথম চড়া—সুতরাং খুব এক নূতন আনন্দ হইতেছিল। জাহাজে আমাদের দুই পরিবার ছাড়া আর কোনও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিল না, কাজেই আমরা নির্ব্বিবাদে সব ক্যাবিনগুলিই অধিকার করিয়াছিলাম। ক্যাবিনগুলি খুব সাজান, আর ইলেকট্রিক পাখা ও আলোয় বিভূষিত। স্প্রিংএর খাটগুলি ও তাহার বিছানাগুলিই বা কি নরম—শুইয়া আরাম আছে! বড়ই মজা লাগিতে লাগিল;—যেন "I am the master of all I survey"—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলাম। ডাইনিং রুমে খানসামা সর্ব্বদা হাজির। কিছুতেই আর কৌতূহল নিবৃত্ত হইতেছিল না—কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল। শেষকালে বাবার ধমকানিতে অগত্যা শয্যার আশ্রয় লইতে হইল। আমি আর আমার এক পিস্তুত ভাই একটা কেবিনে শুইলাম—সে কি আরাম! কিছুক্ষণ গল্প চলিল, তার পর আমি কলেজ-ম্যাগাজিন পড়িতে লাগিলাম—বাইরের ঝোড়ো হাওয়া আমাদের দেহমন পুলকিত করিয়া তুলিল। অবশেষে নিশীথের কোন্ প্রহরে, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা জানিতে পারি নাই।

জাহাজের ঘণ্টায় হঠাৎ ঘুমটা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সারেঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম রাত তিনটা। বাহিরে আসিয়া দেখি পাগল হাওয়া মাতামাতি করিতেছে, আমাদের জাহাজখানি এক অকূল বারিধির মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর ছোট ছোট ঢেউগুলি খেলাচ্ছলে সেই ভীষণ অতিকায় অর্ণবযানের গায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া যেন উপহাস করিতেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় তীরের গাছগুলি কোনও রকমে দেখা যাইতেছে মাত্র। এমন সময় বাবা ডাকিয়া বলিলেন, "এখনও রাত রয়েছে, বাহিরে ভয়ানক হাওয়া, এখন শোওগে, যাও"—কিন্তু তখন আর কে শোয়? ঘরে ও বাহিরে কোনও রকমে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলাম, জায়গাটীর নাম আড়কাটী, ভয়ানক বিপজ্জনক স্থান! পাইলট না আসিলে জাহাজ আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। তারপর অনেকক্ষণ পরে নোঙ্গর তুলিবার শব্দ হইল, আমরা আবার ছাড়িলাম। ওদিকে পূর্ব্বাকাশও ক্রমে সিন্দূর-আভা ধারণ করিতেছিল। অনন্ত জলধির মধ্য হইতে সেই অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবার জন্য সকলে ডেকের উপর আসিয়া বসিল। ক্রমে সারা আকাশ অরুণ রাগে রঞ্জিত করিয়া দীপ্তভানু প্রকাশিত হইল—তাহার স্বর্ণখচিত রেখাগুলি আনন্দস্ফীত ঊর্ম্মিমালার সহিত নাচিতে লাগিল। সেই অসীম সলিলবক্ষে নবীন উষার অপরূপ তপনশ্রী সে এক বাস্তবিক

অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। আমি বিভোর হইয়া বাঁশীতে সুর ধরিলাম। প্রভাতআলোর এই চমৎকার শোভা প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা আনিয়া দিল—আমি তন্ময় হইয়া প্রকৃতির মনোহর লীলাখেলা দেখিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, এই সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে যেন আমার একান্ত আত্মীয়তা আছে। এই উদাস হাওয়া আমারই মর্ম্মবারতা জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক।

ক্রমে ক্রমে আমরা ডায়মণ্ডহারবার ছাড়াইয়া সাগরের দিকে ভাসিয়া চলিলাম। আমার আগে ডায়মণ্ড হারবার সম্বন্ধে একটী ভুল ধারণা ছিল যে, না জানি কত বড় বন্দর—কত জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে, কত মাল উঠানামা করিতেছে। কিন্তু হায়! কিছুই নয়। সবই ফাঁকা। কেল্লাটীরও বিশেষত্ব কিছুই নাই; তবে গঙ্গার মোহানার কাছে বলিয়া জলপথে কলিকাতা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। আমরা উপরে সারেঙ্গের কাছে যাইয়া বেশ আলাপ জমাইয়া তুলিলাম। তাহার কাছ থেকে জানিতে পারিলাম যে, আমরা যে ষ্টীমারখানি করিয়া যাইতেছিলাম, সেখানিকে "আসাম ডেস্‌প্যাচ্" বলে। এখানি বরাবর সুন্দরবনের ভিতর দিয়া, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রপথে আসামে যায়। আমাদের জাহাজখানির একতলায় তৃতীয়শ্রেণী, তার অর্দ্ধেক প্রায় কাঠে ভর্ত্তি। এই লাইনে যে সব মাল সরবরাহ হয়, তারমধ্যে কাঠই সব চেয়ে বেশী। উপরে সারেঙ্গের কেবিন হইতে চারিপাশের দৃশ্য আরও সুন্দর দেখা যায়। এখানে গঙ্গা এত প্রশস্ত যে দুইপাশের তীর একরকম অদৃশ্য বলিলেই হয়। ক্রমে আমরা রূপনারায়ণের মোহানার কালো জল,—ইংরাজ ও নবাবের দ্বন্দ্বের লীলাভূমি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হিজলী দ্বীপ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চলিলাম। বাস্তবিক যখন চোখের সামনে ছায়াচিত্রের মত সেই অনন্ত অসীম কূল-কিনারাহীন জলরাশি, ঢেউগুলির সেই হর্ষপূর্ণ নৃত্য, দূরে সুদূরে চক্রবালরেখায় সেই দুই অনন্ত নীলিমার সম্মিলন দেখিতে লাগিলাম, তখন সত্যসত্যই যেন সেই মহাসিন্ধুর ওপার হইতে কানের কাছে কি মধুর অপূর্ব্ব সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। বেলা ১১টার সময় কাকদ্বীপে যাত্রী লইবার জন্য আমাদের জাহাজ থামিল। সেখান থেকে একটী পোষাক পরা, বোধ হয় P. W. D.র লোক উঠিলেন। আমাদের কাকদ্বীপেই নামিবার কথা ছিল, তাই সেখানে ঘাট হইতে দরোয়ান শিউভরত একখানি বড় নৌকা লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আমরা স্থির করিলাম আরও কিছুদূর গিয়া নামখানায় নৌকায় উঠিব, তাই নৌকাখানি জাহাজের পিছনে বাঁধা হইল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল এবং অল্পক্ষণ পরে গঙ্গা ছাড়িয়া একটী খালে প্রবেশ করিল। শীঘ্রই আমরা নামখানায় পৌছিয়া নৌকায় চড়িলাম। ষ্টীমারখানি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া ধুম উদ্গীরণ করিতে করিতে শীঘ্রই দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

আমরা আমাদের স্বদেশী নৌকায় হেলিতে দুলিতে, ধীরে সুস্থে চলিতে লাগিলাম। ভীষণ রৌদ্র; কি আর করি, ছইয়ের তলায় শুইয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম আর বাঁশী বাজাইতে লাগিলাম। এই আমার প্রথম নৌকায় চড়া—বড়ই আমোদ লাগিতেছিল। যাইতে যাইতে একজায়গায় নৌকা বাঁধা হইল। উহারা সকলে নামিয়া মুখ হাত-পা ধুইতে গেল। আমি কেবল নৌকায় বসিয়া কিছু ভক্ষণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। হালের ওপর পা ঝুলাইয়া দিয়া মনের আনন্দে কয়েকটী সন্দেশ উদরসাৎ করিতেছি, এমন সময় দেখি আমাদের পাশ দিয়া একখানি নৌকা যাইতেছে; তাহার ভিতর একটী ভদ্রলোক বসিয়া কমলালেবু খাইতেছেন। হঠাৎ দেখি তিনি আর কেহই নহেন, আমারই মাতুলসম্পর্কীয় আত্মীয়। এমন জায়গায় আমরা দুই জনেই দুজনকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম "এই যে—মামা যে!" তিনিও লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "আরে, তুমি কোত্থেকে?" যাহা হউক, তাঁহাকে এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইল। তিনিও তাঁহাদের জমীদারীতে যাইতেছেন; সুতরাং আমরা ধরিয়া বসিলাম, আমাদের সঙ্গে এক নৌকাতেই যাইতে হইবে। তাঁহার হাসি ও গল্পে সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল—তিনি খুব আমুদে লোক। ক্রমে আমরা নামখানা ছাড়াইয়া সপ্তমুখীতে আসিয়া পড়িলাম। এখানে সাতটী নদী বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দিক্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া চারিদিকে অসীম জলরাশি বিস্তৃত, যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই জল শুধু জল! কোনও দিকেই কূলের চিহ্নমাত্রও নাই। প্রকৃতির এই অপরূপ বিশালত্বের মধ্যে ক্ষুদ্র মানুষ সত্য সত্যই আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন মনে হয়, হে বিশ্বপতি জগৎস্রষ্টা! "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে"। একান্ত সসীম আমরা, সেই অসীম সত্তার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম; আত্মহারা হইয়া অনন্তের সেই বিরাট রূপ অনুভব করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক অতি নীচ ও কুটীল মনও এই মহান্ দৃশ্যের স্পর্শে এক উদার উদাস কল্পনায় ভরিয়া

যায়, আমিত্বের সব অহঙ্কার ঘুচিয়া গিয়া, থাকে শুধু এক বিপুল শূন্যতা, যাহা ধীরে ধীরে অনন্তের সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে।

এই অপার বারিসমুদ্রের মধ্য দিয়া আমাদের নৌকাখানি নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আনন্দে আমার চিত্তবিভোর হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু গুরুজনদিগের মধ্যে একজনের নৌকায় ভয়ানক ভয়, তিনি এই অকূল পাথারে বিশেষ অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অনেকেই খুব আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভাতে ভাত তৈয়ারী হইল—আমরা সকলে মিলিয়া আমোদ করিয়া খাইলাম। এ রকম খাওয়া বোধ হয় আর কখনও জুটিবে না। চাকর, বামন, লোকজনেরও অভাব ছিল না; বিস্তর গিয়াছিল আমাদের সঙ্গে। বিকালবেলা আমরা চন্দনপীড়ি ঘুরিয়া একটী অপেক্ষাকৃত ছোট খালের ভিতর ঢুকিলাম। তাও সে নেহাত ছোট নয়—আমাদের কলিকাতার গঙ্গার দ্বিগুণ। কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে খাল বা নদীর ভিতর দিয়া আসিতেছিলাম, তাহার তুলনায় ছোট। এই সুদূর সুন্দরবনে জলের ওপর বিচিত্ররঙ্গে রঙ্গীন আর একবার মনোরম সূর্য্যাস্ত দেখা গেল, যা চিরকাল চিত্তপটে আঁকা থাকিবে। বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত:হইয়া অন্ধকারের সঙ্গে কখন যে আমার চোখদুটী জড়াইয়া আসিয়াছে—তাহা জানিতে পারি নাই। একবার যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি দুধারে ভীষণ অরণ্যানী; ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের নৌকা ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। মাঝিরা উৎসাহিত হইয়া "সাবাস্ সাবাস্" চীৎকার করিতেছে, আর সেই নিবিড় নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হরিণের শীৎকার বনস্থলী আলোড়িত করিতেছে। সঙ্গীরা সব বাঘের গল্প করিতে ব্যস্ত। আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন জাগিলাম, তখন দেখি মহা হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে,—মামাকে নামাইয়া দিবার জন্য। তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমরাও নামিলাম—তখন রাত প্রায় ১১টা। এই রকম সমস্ত দিন সমস্ত রাত জলপথে কাটাইয়া আমরা আবার ভূমিতে অবতরণ করিলাম। ঘাট থেকে কাছারী বাড়ী খানিক রাস্তা। অস্পষ্ট আলোয় আলের উপর দিয়া হাঁটিয়া কোনও রকমে পৌছান গেল। তারপর কিঞ্চিৎ মুড়ি খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। মাটীর ঘর, বেশ নূতন নূতন লাগিতেছিল। তারপর দিন ভোরবেলা উঠিয়াই, চা খাইয়া ২নং লাটে পুরাণ কাছারীতে নৌকা করিয়া যাওয়া গেল।

হিংসার আগুন।

(স্বামী ক্ষেমানন্দ)

ভারতে পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে। এদেশে ইংরাজ আগমনের প্রথম অবস্থায় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি একটী পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছিল। সেই সময়ে এদেশের অধিবাসীগণ মুসলমান নবাবদিগের প্রবর্ত্তিত আলস্যবিজড়িত সভ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিদিগের কর্ম্মঠতা দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পরে যখন ঐ সকল পাশ্চাত্যজাতি জয়ী হইয় ভারত অধিকার করিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে ইংরাজেরাই নানা কারণে এদেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিল কিন্তু সেই জয়ী ইংরাজের বণিকমূর্ত্তি কালের সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর প্রকট হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে এদেশবাসীগণ নানাবিধ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। আমরা ইহা বলিলে বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না যে, সেই সময় বণিক ইংরাজেরা যে হিংসার বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, আজ প্রায় দুইশত বৎসর হইতে চলিল, এই সুদূর ব্যবধানের পর হিংসার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে ভারতবাসীর মনে প্রতিহিংসার ভাব নানা আকারে প্রকারে দেখা দিতেছে।

ক্রমে ভারতবাসী বণিক ইংরাজদিগের নির্ম্মম শাসনের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা এদেশবাসীর মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিয়া বণিকবৃত্তির যথাসম্ভব লাঘব করিয়া নবতর শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর এই নবতর শাসনপ্রণালী ভারতের পরিবর্ত্তনের আর একটি যুগ সূচীত করিয়া দিয়াছিল। সেই শাসনপ্রণালীর ভিতরেও যেটুকু বণিকভাব অবশিষ্ট ছিল তাহারও বোঝা বড় কম ছিল না। এদেশে ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সেই বাকী বণিকভাবের বোঝার উপর আরও বোঝা তিল তিল করিয়া চাপিতে লাগিল; এবং এদেশবাসীর অজ্ঞাতসারে দারিদ্র্য-দুঃখ সোনার ভারতকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া চলিল। এই দারিদ্র্য ভিতরে ভিতরে যে কত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর সম্যক প্রকাশ পাইল। আমাদের বিশ্বাস, দেশের এই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দারিদ্র্যই বর্ত্তমান অশান্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ। এখানেও দেখি, ইংরাজশাসন দেশের যতই কেন মঙ্গলজনক হউক না, তাহারই অন্তর্নিহিত বণিকভাবমূলক হিংসার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপেই বহুবিস্তৃত অশান্তি স্বাধীনতার আকাঙ্খার আকারে

স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর আজ প্রায় শত বর্ষ হইতে চলিল, ঐ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রে রাখিয়া নবতর পরিবর্ত্তনের যুগ আবির্ভূত হইয়াছে।

এদেশবাসী প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ন্যূনাধিক জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপায় লইয়াই দুইটী সম্প্রদায় সমুত্থিত হইয়াছে দেখা যায়। এক সম্প্রদায়ের মত, হিংসাকে হিংসা দ্বারাই বাধা প্রদান করিতে হইবে; অপর সম্প্রদায়ের মত, হিংসাকে অহিংসা দ্বারা জয় করিতে হইবে। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন অহিংসাসিদ্ধ মহাত্মা গান্ধী।

বলা বাহুল্য, আমরাও এই শেষোক্ত প্রণালীরই পক্ষপাতী। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পোষণ করিতে আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না। হিংসার আঘাত প্রাপ্ত হইলেই প্রতিহিংসা লইবার জন্য আমাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠে বটে; কিন্তু সেই প্রতিহিংসা লইতে গিয়া আমরা চারিদিকে যে হিংসার আগুন ছড়াইয়া দিই, তাহার ফল অতীব ভয়াবহ। সেই আগুনে দেশের জাতির ও জনসাধারণের কত যে অনিষ্ট হয়, কতলোক যে পতঙ্গের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে আমরা সংবাদ-পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গরাজ্যে প্রজাদিগের উপর বণিকভাগের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের প্রভু বেলজীয়গণ উহাদিগের উপর হস্তচ্ছেদ, কর্ণচ্ছেদ, পদচ্ছেদ প্রভৃতি কি ভীষণ অত্যাচার করিত। এক ইংরাজ মিশনারী তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, সেই অত্যাচার এখনও থামে নাই। ঐ অত্যাচাররূপ হিংসার প্রতিক্রিয়ায় কঙ্গবাসীদিগের অন্তরে যে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিয়া-ছিল, তাহাই ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে বড়ই তীব্রভাব ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। এই সেদিন তাহারা ঐ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া বেলজিয়াম রাজ্যের প্রতিনিধি কমিশনারকে বধ করিয়া তাঁহার মাংসে নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিয়া তবে সোয়াস্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রত্যুত্তরে বেলজীয়গণ কঠো-রতর শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, কঙ্গোবাসীদিগের মধ্যে অশান্তি দূর হইয়াছে। কিন্তু হায়! কে জানে যে অশান্তি সত্যই দূর হইয়াছে কি না, অথবা ইহার ফল কোথায় গিয়া কি আকার ধারণ করিবে!

অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করিতে অগ্রসর হইলে আপাতত নানাবিধ কষ্ট আসিয়া আমাদিগকে পিষিয়া মারিতে উদ্যত হয় বটে, হিংসার আঘাত প্রবলবেগে আসিয়া অনেক স্থলে মর্ম্মগ্রন্থিসকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তখন ভগবানের সিংহাসন টলমল করিতে থাকে; ভগবান তখন সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া হিংসাকারীদিগের সম্মুখে রুদ্রবেশে বজ্রহস্তে দণ্ডায়মান হন এবং মাতা যেমন কঠিন আঘাত-প্রাপ্ত সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া সর্ব্ববিধ উপায়ে সান্ত্বনা ও শান্তি দিতে থাকেন, ভগবানও সেইরূপ তাঁহার আঘাত-জর্জ্জরিত অহিংসাপন্থী সন্তানদিগকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করিতে থাকেন।

ইহা কল্পনাকল্পনা নহে—ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই যে ভারতবাসী আজ স্বরাজলাভের পথে যেটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত অহিংসার বিশুদ্ধ পথে চালবারই ফলে। অহিংসাপন্থীগণ যে সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই সংযমই তো তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে দেশবাসীকে স্বভাবতই স্বরাজলাভের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দেয়। ইহার বিপরীতে যাঁহারা প্রতিহিংসার আগুন চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে উদ্যত হন, তাঁহারা প্রকৃত সংযমের মর্ম্ম কতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় যেমন প্রতিহিংসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদেরও প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়ায় নবতর হিংসা জন্মলাভ করে। ভারতবাসী বহুযুগের সাধনার অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত অহিংসাসিদ্ধিরই মহাবাণী লাভ করিয়াছে। অহিংসার পথে চলিলে আমরা সদ্য সদ্য তাহার ফল হস্তগত নাও করিতে পারি, কিন্তু তাহার ফল যে সুনিশ্চিত এবং স্থায়ী তাহা আমদর্শী চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই সমর্থন করিবেন নিঃসন্দেহ। এই অহিংসাসিদ্ধিরই বলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচ্য সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী চীন জাপান প্রভৃতি দেশ অবধি, প্রতীচ্য সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী সুদূর আমে-রিকা পর্য্যন্ত সভ্য ও অসভ্য কত-না রাজ্যে অধিকার করিয়াছিল। আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে তাহার পরিচয় পাইয়া জগদ্বাসী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

একদিকে আমরা যেমন হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লওয়া অনুমোদন করি না, সেইরূপ প্রতিহিংসা জাগাইয়া তুলিবার প্রধান উপায় হিংসার আঘাত দেওয়াকেও সমর্থন করি না। আমরা দেশবাসীকে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযমের পথে চলিয়াই স্বরাজলাভের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি; এবং হিংসা প্রতি-হিংসার প্রণালী অবলম্বনে বিরত হইতে উপদেশ দিই। হিংসাপ্রতিহিংসার আগুন চারিদিকে ছড়াইতে থাকিলে তাহা দ্বারা দেশের অনেক মন্দ হয়তো বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে অনেক অধিক ভালও ভস্মীভূত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

THE BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(1)

In the preceding pages we have endeavoured to trace the gradual growth of the *Samaj* from its foundation to the present day. During one period of its development we have spoken of the establishment of branch *Samajes* throughout the country. We have now to sketch the history of the most important and extensive branch *Samaj* founded, and professing ostensibly more liberal and progressive views.

1. Keshub Chunder Sen, founder of the Brahma Samaj of India, joined Brahmo Samaj—1859 A.D.

While Devendranath Thakur was cautiously and gradually introducing social and religious reforms among his followers, the *Samaj* was joined in 1859 by an ambitious, enthusiastic and energetic youth possessed of great talents and enthusiasm. His ardour for immediate and universal reform led to differences of opinion, and ultimately culminated in a schism, which resulted in the establishment of a branch church called the *Samaj of India*, to distinguish it from the original *Samaj*. The youth alluded to is Keshub Chunder Sen, and as the history of the schism fomented by him is intimately connected with his life, we shall endeavour before narrating the one to give some account of the other.

2. Birth of Keshub Chander.

Keshub Chunder Sen was born on the 19th November 1832 at Kalutola, in Calcutta, of a well-known family of the Vaidya or medical caste. He was the second son of Pyari Mohun Sen, dewan or chief native manager of the Government Mint at Calcutta, who is reported to have been a man of kind and benevolent disposition and to have died in the prime of life, leaving the infant Keshub to the care of his widow and of his surviving father, Ram Kumal Sen.

3. His grand father, Ramkumal Sen.

Ram Kumal Sen, the grand-father of Keshub, was a man of talents and reputation, and held important public offices under Professor H. H. Wilson, then Secretary to the Educational Chuncil of Bengal and Mint Master of Calcutta. He was also the compiler of an Anglo-Vernacular Dictionary, which was then esteemed the best of its kind. He was a Vaishnava in his religion, and a most bigoted idolator, who took as much interest in thwarting the progress of reformation as his grand-son afterwards took in promoting its aim and purposes.

4. Keshub's boyhood.

In his boyhood Keshub Chander was chiefly remarkable for his independence of character, which seemed to foreshadow his future greatness; and his grand-father was not backward, from many traits in the boy's character, to predict his future leadership of men. Born in a family of idolators, he was naturally brought up in the midst of the idolatrous practices and ceremonies of his domestic circle, and his youthful mind was deeply instilled with all the superstitions and prejudices inherent to a Hindu. His obedience to and love of his mother was a predominant feature in his character, and must have been remarkable to have been noticed among a people who are famous for their filial piety and affection. He never took any food but at the bidding of, and from the same dish as his mother, a circumstance to which he owes his habits of self-denial and simplicity in his food, because Hindu widows of respectable families are ever constrained to live upon simple vegetable diet. He early displayed a religious bent of mind, and, accompanied as it was with a gravity of manners, and a purity of conduct, rendered him greatly beloved by every member of his family.

5. His early education.

Of his early education but little is known beyond the fact that he was early initiated in Bengali under a guru mahashoy, who had a private school on the premises,

now, passing under the name of the Albert Hall, and then joined the Hindu College at Calcutta, in the eighth year of his age. He continued his course of English studies up to the first class of the Presidency College, and was all along distinguished as one of the most promising students of that Institution. He was chiefly, in his school-days, noted for the gravity of his manners; and his taciturnity was so great that no one could possibly have presaged his future eloquence.

6. His early display of eloquence.

Although, as stated, he was remarkable for his taciturnity, yet he occasionally displayed the eloquence with which he was gifted, even in his youthful days, to the admiration of his audience. He once personated the part of an Englishman in one of Gilbert's plays, at his country-house, in the presence of several Europeans, who pronounced it a proper and correct delineation, and praised Keshub much for the mode and pronunciation of his delivery. He also availed himself of many oportunities of exhibiting his knowledge of politics in *extempore* speeches, which were so favourably received, that many of his countrymen have declared that had Keshub Chunder followed the profession of the law instead of that of religion, he would have made himself as famous in the former as he has done in the latter.

7. His study of Bible and prayerfulness.

His English education led him to the study of the Bible, a study which, he himself elsewhere states, impressed him with the idea of the unity of God, and there is no doubt that he would have renounced idolatry much sooner than he did, had he had some one to guide and direct him. His religious tendencies were, however, kept alive by prayer. He used to write short hymns and prayers in English, and read them out to his friends in private. His friends and fellow-students, seeing him thus addicted to prayer, thought he had become a Christian, by which title he is still designated by many who do not thoroughly understand the principles of the religion he now professes. For this good custom he suffered much ridicule and annoyance.

8. Keshub considered Christian by his family.

Prayer, though used from the earliest times in India, as we find in the hymns of the Rigveda, and other eulogistic hymns addressed to Hindu deities, fell into disuse under the influence of its philosophical schools, which maintain a theory, somewhat similar to that put forth by Hume, of the immutability of the Divine Nature, and the eternal decrees of God, which are not to be affected, revoked, or altered by the changeable and transient prayers of mortals. It is no wonder then that Bengali youths, who mostly profess a Vedantic or Deistic faith, should ridicule a man given to prayer and that Keshub Chunder's family should consider him a Christian, when he offered up prayers contrary to the custom of Hindu worship, which requires the prayers to be repeated in Sanskrit and the worship to be accompanied with offerings of eatables to the Gods.

9. Result of his prayerfulness.

Notwithstanding the ridicule of his family and friends, Keshub Chunder continued steadfast in his prayers, which he says infused into him a degree of hope, courage, and firmness, which enabled him successfully to withstand the tribulations and persecutions to which he was subsequently exposed. To give the reader an idea of the faith placed by Keshub Chunder in the efficacy of prayer, we will quote his own words on the subject :—

10. Necessity of prayer explaind by Keshub Chunder.

"It is not possible for me sufficiently to explain myself to others why I pray to God every day, and how I came to its practice. Were it possible for me to do without it, I would even from this moment do away with the practice. Had I not felt its necessity, or derived the habit from any reading or preaching, I would not certainly continue in it. I will now relate to you a fact connected with the history of the religious career of my life, at the moment when,

by the grace of God, my eyes were first opened to perceive the light and importance of religion. It was at that very first moment when a series of struggles arose in my heart for paving my way to salvation, that I felt the necessity of prayer. I found my heart was full of darkness, and subject to all worldly ignorance, aspirations, and desires, which had gained their full dominion over me. I found also that I was a poor sinner, and unable to stand in opposition to innumerable adversaries which had been raging both within and without me. Was it possible for me with a weak body, a lifeless heart, a mind dead in sin, to withstand the formidable train of enemies, which had incessantly threatened to overwhelm me from within and without? Was it possible for me to remain firm and steadfast against these without some help or support? In this plight I had no recourse to any book or religious guide for support. I commenced to pray with a soul in deep agony of sin, and derived in secret this enlivening admonition from it, saying to me in the plainest language: 'Pray to God if you would be saved, for none other but God can save the sinner.' This secret and sacred admonition of my inmost soul tended at once to humble my proud heart, and debase my head at the feet of my God, when on a sudden I seemed to behold, amidst a veil of deep darkness, which encompassed me all around, the word '*PRAYER*,' written in golden characters on tho door way to the kingdom of Heaven. This made me believe that there is no other way to the kingdom of God, but through the medium of prayer, and persuaded me at once to cast off all scruples about the necessity of prayer, and betake myself solely to its refuge. This was a day full of bliss to me. Since then I continued praying morning and evening in secrecy, without the help or advice of any human being and lest anybody should deride at my prayer, I kept it quite a secret; because I well know that no sooner would any one come to know it, he would not only revile at me, but try his best to dissuade me from the practice. As I continued in this habit of praying day after day, I found a flash of heavenly light illumining the deep darkness of my inmost soul, and spreading its benign radiance all about me. O! how can I give expression to that stream of joyous illumination which pierced the frightful gloom of sin, which had overspread my soul, and seemed to brighten the hemisphere of my heart with lustre more benign than moonbeams? This infused in me a degree of unspeakable peace and inexpressible delight, compared with which the pleasures of society, and all other joys of the world seemed to be nothing, and which it led me to continue. I really tell you, from the sincerity of my heart, that it was this light which guided me through the succeeding stages of my life, and if it were not for this and the efficacy of prayer, which the Almighty Father vouchsafed of his infinite mercy to show to my perverted soul, there would be no chance of your seeing me preaching to you on this pulpit. Prayer only was the first incentive to my salvation; it was this which led me to my inquiries after truth. It is by means of prayer only that I came to be acquainted with the holy writings and pious men of my time, and it was through the instrumentality of prayer that I have gained the necessary means of spiritual life from that Heavly Father, who has now sent me so far to you."*

11. First religious school established at Kolutola.

While thus improving himself in spirit in the manner described in the above quotation, Keshub Chunder was not less prompt in communicating the result of his enquries to others. Considering this duty to be intimately connected with self improvement in spiritual knowledge, and without a due discharge of which he believes it to be impossible for a man to be saved, Kesub Chunder had at first instituted an evening religious school at Kolutola, of which he himself was the Secretary. Its annual examinations were conducted by respectable gentlemen, and prizes on one

* This speech was delivered by Babu Keshub Chunder Sen before an audience at Bombay, in his mission to that place.

occasion were distributed to the successful students by the famous speaker, George Thompson, who presided. This school lasted for some three years, and then was abolished owing to the want of funds.

12. The Goodwill fraternity 1858 A. D.

Shortly after this occurrence Keshub Chunder started a small club called "The Good-will Fraternity", in 1858, at his own house, which was attended by his friends and fellow-students, in the hopes of securing to his fellow-brethren the peace and happiness he had himself obtained by prayer. This club was inaugurated for the purpose of religious discussion and prayer. Here Keshub Chunder and his friends used to read discourses from the *Tattwabodhini*, recite portions from the writings of Raja Ram Mohun Roy on divine knowledge, deliver *extempore* sermons in English, read select passages from different books, and consult on the best method of attracting the attention of their countrymen to inquiries after divine truth and their eternal welfare.

নানাকথা।

বাঙ্গালা বাঙ্গালীর জন্য।—একটা কথা উঠিয়াছে যে, বাঙ্গালা বাঙ্গালীর জন্য রাখা উচিত অর্থাৎ বঙ্গদেশে যে সকল চাকরি খালি হইবে, সেই সকল পদে বঙ্গের বাহিরের লোক ভর্ত্তি করা সঙ্গত নহে। একদিক দিয়া দেখিলে ইহা কতকটা অসঙ্গত মনে হয় বটে, কারণ দেশনেতাগণ সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে মিলনসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে এইভাব আপাত দৃষ্টিতে কতকটা সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইলেও একটু গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা খুবই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উচ্চপদে প্রবেশ করা বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য না হইলেও খুবই দুঃসাধ্য। এমন কি, আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি অন্যান্য প্রদেশে domiciled হইবার পক্ষেও বাঙ্গালীকে যথেষ্ট বাধা পাইতে হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে আসিয়া অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ উচ্চ পদ পাওয়া অথবা domicilled হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা পাইতে হয় বলিয়া শুনি নাই। আমি জানি একবার কোন উচ্চপদের জন্য একটা বাঙ্গালী এবং একটা পাঞ্জাবী সমতুল্য বিবেচিত হইলেও বাঙ্গালী উপেক্ষিত হইয়া পাঞ্জাবী নিযুক্ত হইলেন। নিজের দেশে যোগ্যতা থাকিলেও বাঙ্গালীর এরূপ উপেক্ষিত হওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; নতুবা পাঞ্জাবী যখন ভারতবাসী তখন তাঁহার নিযুক্ত হওয়ায় দুঃখের কোনই কারণ ছিল না। বঙ্গদেশের বাঙ্গালী এইরূপ উপেক্ষিত হইবার কারণেই ক্রমশই দুঃখদৈন্যের আবর্ত্তে পড়িয়া যাইতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনাকে রক্ষা করা ধর্ম্মকার্য্য এবং আপনাকে রক্ষা না করিলে যখন আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে রক্ষা করা অসম্ভব হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মেই আমরা সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হই। এই প্রকৃতি-সিদ্ধ ভগবন্নিহিত মঙ্গলনীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিব যে, আত্মরক্ষার পরেই আত্মীয়স্বজন ও পরিজন-বর্গকে রক্ষা করা উচিত এবং সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিব, আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীকে রক্ষা করা এবং তৎপরে অন্যান্য ভারতবাসীকে রক্ষা করা এবং তাহারও পরে অন্যান্য জগতবাসীকে রক্ষা করা। আপনাকে রক্ষা না করিয়া আমরা যদি দূর-দূরান্তরের অধিবাসীদিগকে (সংস্র বিপদগ্রস্ত হইলেও) রক্ষা করিতে অগ্রসর হই, তবে আমরা যে তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করিব এবং সেই কারণে উপহাসের পাত্র হইব, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না! সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষার পন্থা যদি নীতি-সঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালাকে বাঙ্গালীর জন্য রাখার কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পক্ষপাতের কোন কথাই উঠিতে পারে না। যতদিন অন্য দেশে বাঙ্গালার প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ থাকিবে, ততদিনের জন্যই আমা-দিগের উপরোক্ত পরামর্শ। কিন্তু আমাদিগের প্রকৃত মত এই যে ভারতবাসীকে ভারতবাসী বলিয়াই দেখা কর্ত্তব্য এবং ভারতের কোন অংশে কোন ভারতবাসীর প্রবেশ নিরুদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় পদসমূহে বাঙ্গালীর নিয়োগ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছিল। তদুত্তরে শোনা গিয়াছে ঐ সকল পদে বাঙ্গালীর নিয়োগের অল্পতার কারণ, বাঙ্গালীর যোগ্যতার অপেক্ষাকৃত অভাব। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী নিজেদের যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই অপবাদ নিরাকরণ পূর্ব্বক গৌরবান্বিত পূর্ব্ব-অধিকারলাভে যত্নবান হইবেন।

সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাপরিষদ—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়, স্কুল ও কলেজের এবং টোলের অধ্যাপকদিগকে লইয়া উপরোক্ত নামে একটি সঙ্গত-সভা খুলিয়াছেন। গত ৯ই আগষ্ট মঙ্গল্য বেদগান করিয়া ইহা খোলা হইয়াছে। দাসগুপ্ত মহাশয় ইহার উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বশেষে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুন্দর কীর্ত্তন করিয়া ইহার উপসংহার করেন। আমরা এরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠান সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। ইহার ফলে প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকগণের পরস্পরের মধ্যে শিক্ষার ও সদ্ভাবের আদানপ্রদান হয়। ইহার জন্য হয় তো অনুষ্ঠাতাদিগকে অনেক উপহাস-পরিহাস সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সে সমস্তই সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি লইয়া প্রাচীনপন্থীগণ এক সময় কত না উপহাস পরিহাস করিয়াছিলেন এবং উহার পথে কত না বিঘ্নবিরোধ আনিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সে সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই বলিয়া আজ আমরা স্ত্রীশিক্ষার এত প্রসার ও গভীরতা দেখিতেছি। ঘোর প্রাচীনপন্থীগণও সাদরে ও সাগ্রহে স্ত্রীশিক্ষা অবলম্বন করিতেছেন দেখি ও সংবাদ পাই। আমাদের একটী পরামর্শ এই যে, ডাঃ দাসগুপ্ত তাঁহার পরিষদের এরূপ ব্যবস্থা করেন যে তিনি সহসা অন্যত্র বদলী হইলেও পরিষদটী যেন অকালে মৃত্যুমুখে না পড়ে।

প্রাণদণ্ডরহিত—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, বর্ত্তমান নেপালরাজের রাজত্বে নেপাল হইতে আপাতত পাঁচ বৎসরের জন্য প্রাণদণ্ড রহিত করা হইয়াছে। ইহা চিরকালের জন্য রহিত হইলে আমরা আরো সুখী হইতাম। একটী প্রাণ নষ্ট হইলে আর একটি প্রাণ নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে করি না। তদ্ব্যতীত, নানা কারণে অনেক ভুলভ্রান্তিতে বিচারেরও ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভব এবং হইয়াও থাকে। এই ভুল ভ্রান্তির ফলে কত সময়ে নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। এখানে সেই ঈশপের গল্প মনে পড়ে, প্রকৃত অনিষ্টকারী বকগুলির মধ্যে থাকিবার কারণে নির্দ্দোষ সারসও নিহত হইয়াছিল। প্রাণদণ্ড হইলে দোষী বা নির্দ্দোষ কাহারও পুনর্জীবনলাভের সম্ভাবনা থাকে না; বরঞ্চ প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্যবিধ শাস্তি হইলে দোষী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিবার এবং আপনাকে দোষনির্ম্মুক্ত করিবার একটা অবসর পায়। এ বিষয়ে বিলাতে বর্ত্তমানে বিস্তৃত আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের সূত্রপাত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের আরম্ভে হইয়া আজ পর্য্যন্ত বিরত হয় নাই এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরাও এ বিষয়ে কিছু পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে তত্ত্ববোধিনীতে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

প্রার্থনাসমাজে শ্রীযুক্ত চিৎনিস—আমরা গত ৬ই আগষ্টের Nabavidhan পত্র হইতে জানিয়া দুঃখিত হইলাম, যে প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র সুবোধ পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিৎনিস কমুনিষ্ট শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়কে গৃহে স্থান দিবার জন্য বন্দী হওয়ায় প্রার্থনাসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিৎনিস পরে জামিনে খালাস পাইয়াছেন। আমরা নববিধান পত্রের লেখক শ্রীযুক্ত এস রায়ের সহিত এক মত যে, প্রার্থনাসমাজের এই কার্য্য যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই। আইন ভঙ্গের অপরাধে যে কেহ ধৃত হউন বা বিচারে মুক্তিলাভ করুন, আমরা সে বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন ধর্ম্মসমাজই, রাজনৈতিক অপরাধ ত' দূরের কথা, যে যত বড়ই পাপী হউক বা যতবড় অপরাধে অপরাধী হউক, কোন মানবসন্তানকে উপাসনার অধিকার হইতে বা ধর্ম্মকথা প্রভৃতি শুনিবার অধিকার হইতে বিতাড়িত বা বঞ্চিত করিতে পারে বলিয়া মনে করি না। ভগবান যেমন পাপী-তাপী, সাধুঅসাধুনির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর তাঁহার মঙ্গলকিরণ বর্ষণ করেন, ধর্ম্মসমাজমাত্রই নির্ব্বিশেষে সকল মানব সন্তানেরই উপর স্বীয় মঙ্গলচ্ছায়া বিতরণ করিতে বাধ্য। আমরা জানিনা যে, সমাজে উপাসনাদিতে উপস্থিত হওয়ার অধিকার হইতে প্রার্থনাসমাজ শ্রীযুক্ত চিৎনিসকে বিচ্যুত করিয়াছেন, অথবা সুবোধ পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছেন। যদি কেবল সম্পাদকীয় ভার হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন, তবে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু যদি তাঁহাকে প্রার্থনাসমাজের উপাসনাদিতে যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে, তবে আমরা প্রার্থনাসমাজের কর্তৃপক্ষদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, যে ধর্ম্মসমাজ পাপী তাপী, সাধুঅসাধুনির্ব্বিশেষে সকলকেই ভগবানের নাম শুনাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কোন নীতি অনুসারে উহা কোন মানবসন্তানকেই বোধ হয় সেই ভগবানের নাম শুনিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

দুর্ভিক্ষের হাহাকার ও অসঙ্গত আমোদ।

(শ্রীসত্যকাম শর্ম্মা)

দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদে আর কর্ণপাত করা যায় না। দেশের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত, উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের দাবানল দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, নানাবিধ মহামারী, নানাবিধ রোগ, নানা-প্রকার সামাজিক ব্যাধি, সমস্ত মিলিত হইয়া দেশকে এক মহাশ্মশানে পরিণত করিতে চলিয়াছে। কত নর-নারী, কত বালক-বালিকা, কত শিশু যে অনাহারে কঙ্কালসার দেহে প্রাণত্যাগ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের মধ্যে কত লোক সংবাদ রাখেন যে, বিগত মহাসমরে যত লোক নিহত হইয়াছে, প্রতি বৎসর তদপেক্ষা অনেক বেশী লোক শুধু ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া প্রাণত্যাগ করে। আমাদের মধ্যে কে কত সন্ধান রাখে, সমাজের অত্যা-চারে কত নরনারী স্বামী-পুত্র-কন্যার মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা প্রভৃতি উপায়ে সর্ব্ববিধ জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়াইতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ যেদিকে দেখি, ভারতের সর্ব্বত্র জীয়ন্তে মৃত মনুষ্যদিগের অস্থিকঙ্কালে পরিপূর্ণ এবং শৃগাল, শার্দ্দূল প্রভৃতি ভীষণ শ্বাপদসমূহে পরিবৃত এক মহাশ্মশানের চিত্র সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির চিত্র যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরে দেশের শ্মশানচিত্র কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে পাকা বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া চাকুরিলব্ধ অর্থে দিনগুজরাণ করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট পল্লীবাসীদিগের অবস্থা কল্পনায় আনা সহরবাসীদিগের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যে অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সে চিত্র জীবনে ভুলিতে পারিব না।

বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই শ্মশানক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এই দুর্য্যোগের দিনেও বায়স্কোপ থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে গিয়া এবং মহিলানৃত্য প্রভৃতি দুর্নীতিপ্ররোচক আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানআয়োজন করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারেন, এমনও দেশবাসী আছেন। স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসারবৃদ্ধি, পর্দ্দা-প্রথা রহিত করা বা নৃত্যকলাকে ঘৃণা হইতে মুক্তিদান করা প্রভৃতি যে কোন অছিলায় হৌক না কেন, যাঁহারা ঐ সকল দুর্নীতির উৎস অনুষ্ঠানাদির আয়োজনে প্রবৃত্ত হন বা উৎসাহ দেন, তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে আমরা অক্ষম। তাঁহাদের হাতে বল আছে বলিয়া তাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষীদের হিতকথা গ্রহণের যোগ্য মনে করেন না। তাঁহারা চান একটা বিরাট হৈ-চৈ এবং কাগজে কলমে নাম জাহির। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের আহ্বানে শত শত লঘু-চিত্ত বালক ও যুবক এবং বালিকা ও মহিলা ঐ অশ্লীল আমোদপ্রমোদের আগুনে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিবার জন্য উপস্থিত হইবে। এই প্রকারে তাঁহারা দেশবাসী জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে নেতারূপে দাঁড় করান এবং দেশকে স্বখাত সলিলে ডুবাইয়া মারিতে উদ্যত হন।

আমরা জানি, তাঁহাদের কার্য্যের এইরূপ প্রতিবাদে বিরক্তিভাজন হইব এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের নিকট আমরা নানা বিষয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিব। তথাপি যতদিন আমাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া না যায়, ততদিন আমরা দেশের ঐ সকল মহা সর্ব্বনাশকর কার্য্যের প্রতিবাদে ক্ষান্ত হইব না। দেশের জন্য যদি তাঁহাদের হৃদয় সত্যই কাঁদিত, তবে তাঁহারা অন্তত দেশের এই করাল দুর্দ্দিনে, যখন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক প্রভৃতি শতবিধ আকারে দণ্ডায়মান মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা দেশবাসী আত্মবলি দিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইতেছেন না, বরঞ্চ হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া ভারতের ইতিহাস নবতরভাবে সংরচিত করিতে চলিয়াছেন, সেই এই দুর্দ্দিনে ঐ সকল দুর্নীতিপর অনু-ষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তনে বা উহাদের উৎসাহদানে অগ্রসর হওয়া ত দূরে থাক, ঐ সকল বন্ধ করিয়া যে সকল কার্য্যে দেশের ছেলেরা দুই মুঠা অন্ন পাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে, সেই সকল কার্য্যেরই উৎসাহদানে তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, কত বিদ্যালয়ের ছাত্র অভিভাবক-গণের কষ্টসঞ্চিত অশ্রুদিগ্ধ অর্থ প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় প্রভৃতির ছুতায় আনাইয়া ঐ সকল আমোদপ্রমোদ দেখিবার জন্য ব্যয় করে এবং সমস্ত পরিবারকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা করে। এই দুর্ভিক্ষ-দুর্দ্দিনে তাঁহাদের অপেক্ষা, যে অমলেন্দু গোস্বামী বি-এ জুতাবুরুশের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যে সকল যুবক ফলমূল ও তরি-তরকারীর বোঝা নিজেদের মাথায় বহন করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর নমস্য।

মান যশ ও অর্থলাভ প্রভৃতি স্বার্থের জন্য মানুষ যে কি পর্য্যন্ত নীচে নামিতে পারে, তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা অবাক হইয়াছি। কোন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তাঁহার অশ্লীলতামাখা উপন্যাস হইতে

বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া ঐরূপ উপন্যাস-লিখনে বিরত হইতে পারেন না, ইহা তিনি লেখকের এক বন্ধুকে জানাইয়াছেন। এই সকল তথাকথিত নেতা দেখিবার অবসর পান না বা দেখিতে চান না যে, তাঁহারা যে সকল ঢিল ছুড়িতেছেন, সেই সকল ঢিল দেশবাসীর গাত্রে কোথায় লাগিয়া কি প্রকার বিপদ ঘনাইয়া আনিবে।

আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থলে মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্য ভুলিবার জন্য শ্মশানের পার্শ্বচর শ্মশানবন্ধুগণ মদ্যপানে আপনাকে বৃথাই ভুলাইয়া রাখিতে চায়, সেইরূপ এই সকল তথাকথিত দেশনেতা আপনাদিগের অনুষ্ঠিত অসঙ্গত কার্য্যের ফল ভুলিবার জন্য পরে পরে অনেকগুলি অসঙ্গত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। দেশে মৃত্যু যখন প্রলয়ঙ্কর শিবের ডমরুবাদনের সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়ে ইহাঁরা যে কি প্রকারে এই সকল অসঙ্গত আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহাতে তাঁহাদের অন্তরের নির্ম্মম বা callous ভাব প্রকাশ পায়, ইহা বলিতে আমরা কিছুতেই দ্বিধা করিব না। ইহাকেই বলে "রোম পুড়িয়া ছাই হইতেছে, নীরো বাঁশী বাজাইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে" "Nero was fiddling while Rome was burning"

আমরা যেন মনে রাখি যে, এইরূপ দুর্নীতির উত্তেজক কার্য্যসমূহের ফলে রোমের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দুর্নীতিপ্রাণ অধর্ম্ম ও তদনুসঙ্গী মনোবৃত্তি যদি দেশের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলে তবে ভারত ধ্বংস ও মহা বিনাশের আবর্ত্তে নিশ্চয় পতিত হইবে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, ধর্ম্মভূমি ভারতভূমির ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীগণ দুর্নীতির পূতিগন্ধময় আমোদ-প্রমোদে মোহজনিত ক্ষণিক উত্তেজনার কারণে দুই-একবার নামিতে পারেন, কিন্তু বিনাশের করাল কবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ভারতবাসী গাত্র হইতে দুর্নীতি ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার ধর্ম্মের জ্যোতিতে নব-তরভাবে বিভূষিত হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান ভারতভূমিকে কখনই অধর্ম্মের গভীর কূপে চিরনিমগ্ন থাকিতে দিবেন না। যাঁহারা এই সকল অসঙ্গত আমোদ-প্রমোদ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী, তাঁহারা ক্ষণেকের জন্য কেবল নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দেশের ভবিষ্যত আশার স্থল যুবকগণকে চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইতে প্রবৃত্ত করিতেছেন ইহাই সমধিক পরিতাপের বিষয়।

আমরা ভারতীয় নরনারীর নিকট করযোড়ে এই নিবেদন করি যে,যে ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা কেবল অতীতকালে নহে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতকে জগতের পূজার্হ করিয়া রাখিয়াছে; যে ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতার ভিতরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজ মহাত্মা গান্ধি কেবল ভারতশাসকদিগের নহে কিন্তু সমগ্র জগতের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিতেছেন, তাঁহারা সেই ভারতের অধিবাসী হইয়া ঐ সকল দুর্নীতিপর আমোদপ্রমোদ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ান, ঐ সকল আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানসমূহকে অবজ্ঞার সহিত দূরে অপসারিত করিয়া অধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে বিজয়ী করুন। অসঙ্গত আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে সবল মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান না হইলে অদূর-ভবিষ্যতে দুর্নীতির ভীষণ ভূকম্পন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি সহ এই সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে নিঃসন্দেহ—দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে পড়িতে হইবে।

ঐ সকল অসঙ্গত আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিবার সময় তাঁহাদের কি একবারও মনে হয় না যে, তাঁহাদের গৃহে কত অনাথ ও অনাথা অনশনে অর্দ্ধাশনে জীর্ণবস্ত্রে শীর্ণদেহে কালাতিপাত করিতেছে ? তাঁহাদের দুঃখিনী জননীর অশ্রু কি একবারও তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে না ? দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করিবার জন্য শতবার ভিক্ষা করিলেও যে অর্থ আমরা হাত তুলিয়া দিতে অক্ষম, এই সকল অশ্লীলতা-মাখা উপন্যাস ও অসঙ্গত আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে তাহার দশগুণ বিশগুণ অর্থ ন্যায় বা অন্যায় উপায়ে সংগ্রহ করিয়াও অপচয় করিতে কুণ্ঠিত হই না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থের ঐরূপ অপচয় করার পরিবর্ত্তে উহা সঞ্চিত রাখাও মঙ্গলকর। হাতে অর্থ সঞ্চিত থাকিলে সময়ে তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিবার সম্ভাবনা ও শক্তিসামর্থ্য আসে।

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই, যাহা যথার্থ চারুকলা, যাহা সত্য-সুন্দর-মঙ্গল ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে, আমরা তাহার অনুশীলনের বিরোধী নহি ; কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও অশান্তি যখন সমস্ত দেশকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, যখন দুর্ভিক্ষের দাবানল :দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশবাসীকে তিলে :তিলে পোড়াইয়া মারিতেছে, সে সময়ে চারুকলা অনুশীলনের নামে নৃত্য প্রভৃতি অসঙ্গত আমোদপ্রমোদে গা ভাসাইয়া দেওয়া যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার ও মূঢ়তার পরিচয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে না। জীবনপ্রদীপ যখন নির্ব্বাণপ্রায় হয়, মৃত্যু যখন মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কে আমোদে প্রমোদে বা চারুকলার অনুশীলনে, তাহা যতই কেন ভাল হউক না, গা ভাসাইতে প্রবৃত্ত হয় ? বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে চারু-কলায় :কত অনুশীলন বা আমোদপ্রমোদের কত

অনুষ্ঠান হইয়াছিল ? আমাদেরও দেশে বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের সময়ে বলিতে গেলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে মহা সংগ্রাম লাগিয়াছে। যদি উন্নতি ও শ্রেয় চাও, তবে অধর্ম্ম ও তৎপ্রলোচক দুর্নীতিপর আমোদপ্রমোদের মস্তক পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধর্ম্ম ও তৎসহায় সুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমাদের কল্যাণ ও শ্রেয় তো হইবেই না, প্রত্যুত উত্তরকালে ইহার জন্য আমাদের নামে যে কালিমা লিপ্ত হইবে এবং যে অকীর্ত্তি ঘোষিত হইবে, তাহা কোনকালে যে মুছিয়া যাইবে, তাহা বলা সুকঠিন।

আজ ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন নিজ নিজ দেশের উন্নতিসাধনে এবং দুর্নীতির অপসারণে প্রাণপাত করিতেছেন, সে সময়ে আমরা দুর্নীতিময় আমোদপ্রমোদে নৃত্য করিয়া বাহবাসূচক করতালি লাভ করিবার জন্য লালায়িত ! পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন অর্থ সঞ্চিত রাখিবার উপায়সমূহের অনুসন্ধান চলিতেছে এবং শতবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে, দেশের একটী কপর্দ্দকও যখন ব্যয় করিতে হইলে দেশ-নেতাগণ কত-না আলোচনা ও পরামর্শসভার আয়োজন করেন, সেই সময়ে আমাদের মত দুর্ভাগা ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশের অধিবাসীগণ পাগলের মত দেশের অর্থ যেথানে সেথানে ছড়াইয়া দিতে বা যে কোন উপায়ে নষ্ট করিতে নিতান্তই ব্যস্ত ! মহাবীর আলেকজাণ্ডার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতার একবিন্দু অশ্রুমোচনের জন্য তিনি তাঁহার অধিকৃত সমস্ত রাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। হতভাগা আমরা একটু আমোদপ্রমোদ উপ-ভোগের জন্য, একটুকু স্বার্থসিদ্ধির জন্য, একটুকু নাম-যশের জন্য দুঃখিনী জননীর শত সহস্র অশ্রুবিন্দু অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি—নিজেদের স্বার্থের চরণে দেশের মঙ্গল, জাতির কল্যাণ, সমস্তই সহজে বলিদান করিতে পারি !

গ্রন্থপরিচয়।

প্রশ্নকল্পতরু—শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যানিধি জ্যোতিষার্ণব-প্রণীত। ক্রাউন ১৬ পেজী, ২৭৬ পৃষ্ঠা মূল্য ২॥০ টাকা। পাষাণময়ী কালীবাড়ী, বরিশাল।

আমরা এই গ্রন্থ একখণ্ড পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে প্রশ্নাদি গণনা করা হয় কিংবা কোষ্ঠী প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর খুব যে আস্থা স্থাপন করি, তাহা বলিতে পারি না ; আর যে উহা একেবারেই বিশ্বাস করি না, তাহাও বলিতে পারি না। অবিশ্বাসের কারণ এই, অনেক সময়ে জ্যোতিষীগণ প্রশ্নাদির উত্তরে যাহা বলেন, তাহা সফল হইতে দেখা যায় না। ইহা যে অবিশ্বাস করিবার একটী বিজ্ঞানসঙ্গত কারণ, তাহা মনে হয় না। দিয়াশলায়ের কাঠি ঘর্ষণ কারণে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে যদি সেই কাঠি সিক্ত হইবার কারণে শত ঘর্ষণেও আগুন প্রদান না করে, তবে এক নিশ্বাসে সমস্ত দিয়াশলায়ের কাঠিগুলিকে জ্বলিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নহে। সেইরূপ একজন দুইজন দশজন বা শতজন জ্যোতিষীর উত্তর সর্ব্বাংশে বা কোন অংশ সফল হইল না দেখিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অবিশ্বাস্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। বিজ্ঞানের উপর চলিতে গেলে আমাদিগের সন্ধান করিতে হইবে যে, কোন্ জ্যোতিষীর গণনার কোন্ অংশ ভুল হইয়াছে। এইরূপ করিলেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব হইবে।

জ্যোষিশাস্ত্র যে সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাস্য তাহাও বলিতে পারি না। আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার কোষ্ঠীর সহিত তাঁহার জীবনের খুবই মিল ছিল। আমি জানি যে এই মিলের কারণেই আমার গুরুজনেরা মহর্ষির শেষ অসুস্থতার সময়ে কোষ্ঠী দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথেরই মুখে শুনিয়াছি যে, মহারাজা সার যোতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরেরও কোষ্ঠীর সহিত তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য মিল ছিল। এই আশ্চর্য্য মিলের কারণেই তিনি অনেক সময়ে কোষ্ঠী দেখিয়া শুভকার্য্যাদিতে রত হইতেন। আমিও এক সময়ে আমাদের গৃহ-জ্যোতিষীকে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, উক্ত জ্যোতিষী আমার সম্মুখে সদ্য সদ্য শ্লেট-পেন্সিলের সাহায্যে গণনা করিয়া যে উত্তর দিলেন, তাহা আশ্চর্য্য-রূপে সফল হইতে দেখিলাম। সে সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার ঘোর অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অবধি উহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকে বলেন যে জ্যোতিষ শাস্ত্র যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারে, তবে আমাদের কর্ম্ম কার-বার কোনই প্রয়োজন থাকে না—কর্ম্ম না করিলেও আমাদের জীবনের ভবিতব্য ঘটনাবলী স্বতই ঘটিয়া যাইবে। আমরা এরূপ যুক্তি স্বীকার করিতে অসমর্থ। যদি কোন বৈজ্ঞানিক কোন কোন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণের

ফলে বলিয়া দিতেন যে, কয়েকযুগ পরে বেতারবার্ত্তা আত্মপ্রকাশ করিবে, তবে তাহার অর্থে ইহা ধরিলে চলিবে না যে, জগতের বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকল মানবই হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকুক, আর বেতারবার্ত্তা আপনিই আসিয়া পড়িবে; ইহার বিপরীতে ঐরূপ ভবিষ্যৎবাণী অর্থে আমরা বুঝি যে কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া উক্ত বক্তা বুঝিয়াছিলেন যে, জগতের অন্তত এক সম্প্রদায় ব্যক্তি ঐ বেতারবার্ত্তা আবিষ্কারের অভিমুখে চলিবেন এবং তাঁহাদেরই কার্য্যের ফলে বেতারবার্ত্তা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। জ্যোতিষ শাস্ত্র সেইরূপ বলে যে, আমাদের ভবিষ্যতে কোনরূপ মন্দ ফলের সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা উহা নিজেদের শুভকর্ম্মের ফলে আবার কাটাইয়া উঠিতে পারি। ইহা দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকত্বের যে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে, তাহা আমরা মনে করি না। অপলাপের সম্ভাবনা স্বীকার করিলে সকল বিজ্ঞানেরই বৈজ্ঞানিকত্ব অস্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিবার সহায়তা করিবে বলিয়াই আমরা ইহার প্রকাশে সুখী হইয়াছি। তিনি "প্রশ্নকল্পতরু" নাম দিয়া সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রের সকল বিভাগই অল্লাধিক ছুঁইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে গ্রন্থকর্ত্তা বিনয়সহকারে সঙ্কলন বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমরা ইহাকে জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থের সম্মান দিতে প্রস্তুত আছি। বঙ্গ-ভাষায় জ্যোতিষশাস্ত্রের এরূপ পুস্তক অধিক নাই। গ্রন্থের শেষ ভাগে জ্যোতিষের সাহায্যে রোগাদির নির্ণয়ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন। জানিনা ইহা পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকদিগের অনুমোদিত হইবে কিনা, কিন্তু পরলোকগত স্বনামধন্য কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, বৈদ্যশ্রেষ্ঠগণ জ্যোতিষের দ্বারা রোগনির্ণয়াদি বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়া থাকেন।

অনুশীলনের অভাবে লুপ্তপ্রায় প্রশ্নগণনা বিষয়ে তিনি যে অধ্যবসায় সহকারে সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আরো বিশেষভাবে বিষয়-গুলিকে স্পষ্ট করিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইত বলিয়া মনে হয়। যেমন ধাতু জীব বা মূলবিষয়ক প্রশ্ন-নির্ণয়প্রণালী ১৩ কি ১৪ রকমের আছে। তাহার মধ্যে প্রণালীভেদে ফলের বৈপরীত্যে কি করা কর্ত্তব্য? এক এক নিয়ম অনুসারে গণনায় যদি পৃথক পৃথক ফল পাওয়া যায়, সেরূপক্ষেত্রে ফলবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। সেজন্য জ্যোতিষীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থকারের নিজের অভিজ্ঞতা এই সকল বিষয়ে লিখিত থাকিলে ভাল হইত। রাশি ও গ্রহগণের স্বরূপ নিরূপণস্থলে তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। গ্রহের বর্ণনির্দ্দেশ আবশ্যক, যেমন লগ্নস্থ বা লগ্নদর্শী বলবান গ্রহের বর্ণ অনুসারে চৌর্য্যাদির বর্ণনিরূপণ করিতে হয়। দুই একটি উদাহরণ দ্বারা চৌর্য্যাদি বা রোগাদি প্রশ্নের জ্ঞাতব্য বিষয়সকল বিচার করিয়া ফলনির্দ্দেশ করিবার পৌর্ব্বাপর্য্য প্রণালী দেখাইয়া দিলে সাধারণের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইত। তারপর, হয়তো একটা প্রশ্নের উত্তর জানিবার যে প্রণালী লেখা আছে, সেই অনুসারে গ্রহসন্নিবেশ সকলক্ষেত্রে না-ও থাকিতে পারে। মনে করুন, কোন প্রশ্নের উত্তর লগ্নস্থ গ্রহ অনুসারে বলিতে হয়; কিন্তু লগ্নে যদি কোন গ্রহ না থাকে সেক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? নবাংশোক্ত দ্রব্যনির্ণয়স্থানে একই নবাংশে বহু দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার মধ্য হইতে একটীকে বাছিয়া লইবার কোন উপায় আছে কি না? গ্রহ-নির্দ্দিষ্ট ব্যাধিনির্ণয় স্থলে একই গ্রহের দ্বারা বহুরকম রোগ জন্মিতে পারে—প্রশ্নকর্ত্তাকে কোন্ রোগের কথা বলিব? আশা করি গ্রন্থকার জ্যোতিষী মহাশয় পরবর্ত্তী সংস্করণে সাধারণের সুখবোধার্থ তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা দান করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। গ্রন্থকর্ত্তা জ্যোতিষা-চার্য্য মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থের অনুরূপ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—৺সারদাচরণ মিত্র প্রণীত। কাপড়ে সুন্দর স্বর্ণরঞ্জিত বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ১৩৩ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হই-লাম। গ্রন্থখানির নাম হইতেই ইহার বিষয় সহজেই বুঝা যাইতেছে। উৎকলপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, তাহারই বর্ণনা ইহাতে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইহার ভিত্তি হইলেও সারদা বাবুর সিদ্ধহস্তে ইহার লিখিত প্রত্যেক বিষয়টী বড়ই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠি-য়াছে। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি গৌরাঙ্গদেবের জীবনীর মধ্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। শুধু বৈষ্ণবসমাজে নহে কিন্তু বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট ইহা যে সমাদরে পঠিত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। দুঃখের বিষয়, সারদা বাবু তাঁহার "দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িবার পর এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও পড়িবার

ইচ্ছা আমাদের প্রাণে বড়ই জাগ্রত হইতেছে। তাঁহার পুত্র পৌত্রগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা ঐ অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও প্রকাশ করিতে যত্নবান হউন।

কোরাণ-কণিকা।—মীর ফজল আলী বি-এল প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৬ ফর্ম্মা, মূল্য ৸৹ টাকা, প্রাপ্তিস্থান বরিশাল।

এই পুস্তকখানিতে কোরাণের দশটী প্রার্থনা ও ৫টী উপদেশের অংশবিশেষ পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কোরাণের কাব্যানুবাদ দুরূহ হইলেও গ্রন্থকার সরল ও সহজ পদ্যে ইসলাম ধর্ম্মের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় এবং নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। অনুবাদগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইসলাম ধর্ম্মের সারমর্ম্ম ও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। ইহাতে কাব্যরসের আস্বাদ না পাইলেও প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু পরম রসের সন্ধান পাইবেন। এই গ্রন্থপাঠে সমগ্র কোরাণপাঠের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্বতই জাগিয়া উঠিবে। আমরা আশা করি ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মপিপাসু মাত্রই ইহা পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পত্রিকাপরিচয়।

পরিচয়—ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ৫নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৪.০ মাত্র।

আমরা এই সাহিত্যবিষয়ক নূতন ত্রৈমাসিক পত্রের আবির্ভাবে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইংরাজীতে এরূপ ধরণের ত্রৈমাসিকের সংখ্যা খুবই অল্প। বাঙ্গলায় এরূপ একখানিও আছে বলিয়া জানি না। লঘু সাহিত্য ও উপন্যাসই এ যুগে অধিক সমাদর পাইয়া থাকে দেখা যায়; আর তাহাতে অশ্লীলতার স্পর্শ যত বেশী থাকিবে, ততই তাহার সমাদরও অধিকতর হইতে থাকিবে। সাহিত্যের এই দুর্দ্দিনে "পরিচয়ের" ন্যায় একখানি ত্রৈমাসিক পত্র যে বাহির হইতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী, কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়াছি। সর্ব্বপ্রথম স্থান পাইয়াছে বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের—"যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ"। আমরা প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। প্রবন্ধটী বেদান্তরত্ন মহাশয়ের উপযুক্তই হইয়াছে। গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদিক তথ্যে পূর্ণ হইলেও সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। মূল বিষয়টী তিনি আগামী সংখ্যায় খুলিয়া লিখিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—বৌদ্ধধর্ম্মের দান। বৌদ্ধধর্ম্মের ফলস্বরূপ আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাই সরল ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাকচী মহাশয় ঐ সকল দানের একএকটী লইয়া যদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন, তবে তাহা বাঙ্গলাসাহিত্যে অমূল্য দান হইবে, নিঃসন্দেহ। আমাদের আর একটু মনে হয় এই যে, বৌদ্ধধর্ম্মের দানস্বরূপে আমরা এতগুলি মঙ্গলসাধক বিষয় পাইলাম কি কারণে? কোন্ বস্তু কোন্ সত্য বুদ্ধপন্থীদিগকে জগতের হিতসাধক বিভিন্ন বিষয়ের সাধনায় অন্যান্য ধর্ম্মপন্থী অপেক্ষা অধিকতর বল ও প্রেরণা দিয়াছিল, সেই তত্ত্বের সন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলে প্রবোধবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। লেখক প্রবন্ধে ভাব ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কাব্যের মুক্তির পথপ্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল উপলক্ষ করিয়া তিনি প্রবন্ধে এত points বা সঙ্কেত আলোচনার জন্য উপস্থিত করিয়াছেন যে, সেগুলি সহজে একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করা দুরূহ হয়। আমাদের মনে হয় যে, ঐ সকল সঙ্কেতগুলি একএকটি লইয়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে মুক্তির পথটী দেখা সহজ হইত—পাঠকগণ তাহা হইলে সেই একএকটী খোঁটা ধরিয়া মুক্তির পথ সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। লেখক মোটামুটি এ যুগের কবিতা ধরিয়াই তাঁহার বক্তব্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্য প্রভৃতি ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষেও মুক্তির পথপ্রদর্শন এবং পাঠকদের পক্ষেও উহা দেখা অনেক সহজ হইত। ভাবের দিকে আমরা তাঁহার সহিত একমতে বলিতে পারি যে, সমস্ত জ্ঞান যেমন অনন্তস্বরূপে পরিসমাপ্ত হয়, সেইরূপ কাব্যও যতটা সত্য-সুন্দর-মঙ্গল ভাবের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, উহার মুক্তির দুয়ারও ততই প্রশস্তভাবে খুলিয়া যাইবে। ভাষার দিকে সংস্কৃতকাব্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে মনে হয়, প্রত্যেক দুই চরণের শেষভাবে আনুপ্রাসিক শব্দমিল অপেক্ষা যাহাতে যতি রাখিবার প্রথার উপর অধিকতর ঝোঁক দেওয়া হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিলে কাব্য মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদান করিয়া এবিষয়ে মাত্র চতুর্দ্দশপদী কবিতাকেই মুক্তিদান করিয়াছেন ; আমরা চাই সকল-পদী কবিতারই এবম্বিধ মুক্তি। "রুষবিপ্লবের পটভূমিকা" প্রবন্ধে লেখক শ্রীসুশোভন সরকার রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস সংক্ষেপে ও সুলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাশিয়ার বিপ্লবের আমূল বৃত্তান্ত যদি ধারাবাহিকক্রমে তিনি প্রকাশ করেন, তবে তাহা হইতে দেশ বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষণীয় অনেক বিষয় লাভ করিবে। "বিজ্ঞানের সঙ্কট" প্রবন্ধে লেখক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ক্ষীণ আভাস দিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক মহলে বিজ্ঞানের মূল কথা লইয়াই কিরূপ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। আমরা বিজ্ঞানের ক-খ পর্য্যন্তও জানি না, অ-আ মাত্র আরম্ভ করিয়াছি ; সুতরাং আমরাও যে সেই আন্দোলনে পড়িয়া হাবুডুবু খাইব, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? এত দিন মনে হইত, বুঝি সমস্ত পদার্থ-বিজ্ঞান প্রকম্পনবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে ; কিন্তু আজকাল প্রকম্পনবাদের সঙ্গে পরমাণুবাদকেও পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে অল্পে অল্পে স্থান অধিকারে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। লেখক এই সঙ্গে আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রের পদার্থবাদেরও অল্পবিস্তর অলোচনা করিলে ভাল হইত। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "শিল্পীর ব্যথা" আমাদের বড়ই মিষ্টি লাগিল।

"হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা গান" প্রবন্ধের লেখক শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়ের সহিত আমরা একমত যে, 'জগতের সব গানের মধ্যেই মূলগত একটা ঐক্য পাওয়া যায় এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে উহার প্রকাশের প্রণালী বিভিন্ন মাত্র'। এই বিষয় লইয়া ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদির দ্বারা সঙ্গীতানুরাগী জনসাধারণের অন্তরে এই বিষয়টী মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে হেমেন্দ্রবাবুর ন্যায় তিনিও বলেন, সঙ্গীতে স্থূল ভৌগোলিক বিভাগ পরিকল্পনা করিবার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও যাহা কিছু ভাল পাওয়া যায় তাহা প্রাচ্য সঙ্গীতেও আনিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু তাহা প্রাচ্যভাবে সংগঠিত করিয়া। বোধ হয় আমরা বলিতে পারি না যে, পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা গানের মধ্যে একটা বিভাগসূত্র পরিকল্পিত ছিল না। মনে হয় নিধুবাবুর টপ্পা, রামপ্রসাদী গান, কীর্ত্তন প্রভৃতিতেই বাঙ্গলা গানের: প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর দিয়া ব্রহ্মসঙ্গীতের সাহায্যে বাঙ্গলা দেশে ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর বাঙ্গলা গান প্রবর্ত্তিত ও প্রসারিত হইল। তাহার পূর্ব্বে ধ্রুপদ খেয়ালের যে বাঙ্গলা গান ছিল না, তাহা বলি না ; কিন্তু সচরাচর হিন্দুস্থানী গানই গাওয়া হইত। আমাদের মতে কোন রাগিণীতে হিন্দুস্থানীগণ যদি শুদ্ধ "নি" এবং উক্ত রাগিণীর প্রাণ বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী ওস্তাদগণ যদি কোমল "নি" ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া মারামারি করিবার পরিবর্ত্তে কি উপায়ে দেশ-বিদেশে সঙ্গীতের আমদানী রপ্তানী হইয়া বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সঙ্গীত, অবশ্য নিজ নিজ দেশীয়ভাবে গড়িয়া লইয়া, আপনার করিয়া লইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শন করিলে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।—গত ১১ই শ্রাবণ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে ৺দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মসজিদ বাড়ীর ষ্ট্রীটের স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ।—গত ৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীঅমিয়া দেবী তদীয় পিতা ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের চতুর্থাহ শ্রাদ্ধকর্ম্ম স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বর-বাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

রায় বাহাদুর ৺সুরেশচন্দ্র সরকার বিগত ৩১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময় শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান সুবিমল সরকারের পাটনানগরীর বাসভবনে হৃদ্‌রোগে

হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। বিহারে দীর্ঘকাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণতাগুণে প্রভূত যশ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক গিরিধিতে নবনির্ম্মিত আশ্রমবাটিকায় সাধকোচিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইঁহাকে হারাইয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষতঃ বিহার ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহার মনে এমনি একটা অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ভাব বিদ্যমান ছিল, যে ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পীড়া দিত। গত মাঘোৎসবে তিনশাখার জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, উহা গত ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে প্রকাশ পাইবে, তাঁহার জীবনের শেষভাগেও তদীয় অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষণা কিরূপ প্রবল আকারে জাগ্রত ছিল। আমরা ইঁহার সুযোগ্য পুত্রদিগকে এই গভীর শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় প্রদান করুন।

৺সুরেন্দ্রনাথ রায়। সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গত ৪ঠা শ্রাবণ সোমবার দ্বিপ্রহরে গ্রে ষ্ট্রীটের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল ধরিয়া উদরসংক্রান্ত পীড়ায় বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫৭ হইয়াছিল। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সসম্মানে হাইকোর্টে এ্যাসিস্‌টাণ্ট রেজিষ্ট্রার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা ইঁহার পত্নী, কন্যা ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার আত্মার শান্তি ও সুগতি বিধান করুন।

রায় বাহাদুর ৺রাধাবল্লভ চৌধুরী। গত ১৮ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি একাদশ ঘটিকায় ময়মনসিংহের সেরপুর-টাউননিবাসী রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। মাসকয়েক পূর্ব্বে ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ইনি অন্তরে বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পুত্র-পরিজনদিগের এই গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবৎকৃপায় ইনি সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হউন।

পণ্ডিত ৺মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। গত ২০শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রি সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকায় স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৯ হইয়াছিল। ইনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই একজন সুবক্তা ছিলেন। স্বদেশী যুগে দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধপ্রাণ হইয়া ইনি বহুবার কারাবরণ করিয়াছে, এবং বহুক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। ইদানীং ইনি ভাস্কর নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮৩। জীবনের একতারা।

মা! আকাশে বাতাসে তুমি যে গান ভরিয়া দিয়াছ; প্রতি মুহূর্ত্তে যে গান আকাশে বাতাসে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে; প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে যে গানের ঝঙ্কার আমার মরমের প্রত্যেক পরতে প্রবেশ করিতেছে, সে গান আমি কেবলই অবাক হইয়া শুনি। আমার ক্ষমতা নাই যে, সে গান আমি ধরি আর গাহি। আমার জীবনের একতারাতে যে সুর তোমার নামে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই সুরখানিই আমি জানি আর সেই সুরখানিই আমি আপনার মনে গুনগুন করিয়া গান করি। পর্ব্বত হইতে নিঝ্‌রিণীসকল বাহির হইয়া যে গানের সুধা পান করিতে করিতে সুপুষ্ট নদনদীর আকারে সাগরের সঙ্গে মিশিয়া যায়; মহাসাগর যে গান উদাত্তস্বরে নিরবধি গাহিয়া আসিতেছে, আমার ক্ষমতা নাই যে সে গান আমি ধরি আর শিখি। আমার ঐ একতারাতে যে সুর তোমার নামে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই সুরটুকুই আমি ধরিয়াছি, আর তাহাই আমি নিজের মনে গাহিয়া থাকি। তোমার যে গানে রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়া দিনের আলো ঝকমকিয়া উঠে, সে গান কোথায় আমি পাইব? তোমার যে গানে ধরণীর বক্ষ বিদারিয়া ধনরত্নের অফুরন্ত খনিসকল বাহির হইয়া পড়ে, কোথায় আমি পাইব সে গান? আমি তোমার গানগুলি দিনের পর দিন একমনে শুনিতে থাকি; আর তাহার মধ্যে যে সুরখানি আমার একতারায় ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই সুরখানিই আমি নানাভাবে গাহিতে থাকি। তোমার যে গান মায়ের বুকে সন্তানবাৎসল্যের আকারে ঝরিয়া পড়ে, কোথায় পাইব আমি সে গান? আমার জীবনের একতারাতে যে সুরটী ধরা পড়িয়াছে, সেই সুরটীই আমি গুনগুন করিয়া গাহি। অপর কাহারও কাছে আমার সেই একতারা বাজাইয়া গান করিতে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। একমাত্র তোমারই কাছে আমি সেই গান গাহি আর আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া উঠি। আমি আর কিছু চাহি না, এই বর প্রদান কর, যেন সেই একতারাতে তোমারই নাম নিত্যকাল বাজাইতে বাজাইতে আমার জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারি।

৮৪। কাজের ভার ফিরাইয়া লও।

মা! আমাকে ভুলিয়া যাইও না। তুমি আমাকে যে সমস্ত কাজের ভার দিয়াছিলে, সমস্ত দিনের শেষে দেখি, সে সমস্তের কিছুই তো করিতে পারি নাই। যে দুই-একটী কাজে হাত লাগাইয়াছি, তাহাও করিতে করিতে অতি বিশ্রীই হইয়া গিয়াছে। এখন বুঝিতেছি, তোমার কাজে যেমন সমস্ত মন দেওয়া উচিত ছিল, সে রকম মন দিই নাই। এইটী যে বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। তোমার কাজে অবহেলা করিয়া তোমার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, তাহাতেই আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। আর আমাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া বেশী শাস্তি দিও না, আমি তোমার চরণ ধরিয়া বারম্বার ক্ষমা চাহিতেছি। তোমার কথা পদে পদে শুনিতে অবহেলা করি বলিয়াই তো এই দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করিতেছি; শতবিধ বিষময় কণ্টকের আঘাতে দেহমন ছিঁড়িয়া গেল। তোমার কথা যেটুকু শুনি, তোমার কাজে যেটুকু মন দিই, তাহাতেই তো দেখি, সুখশান্তিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। দিকে দিকে তোমার নামের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে, আমার কানে সে শব্দ ছুঁইয়া মাত্র ভাসিয়া যাইতেছে, প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—আমি নিজের বৃথা কার্য্যেই ডুবিয়া আছি। জগতের সকল স্থানেই সুখশান্তি ছড়ানো আছে, দেখিতেছি, বুঝিতেছি; তবু আমার প্রাণ বিষাদের ঘন অন্ধকারেই যেন নিত্য সমাচ্ছন্ন—আমি নিজের রচিত শতবিধ অন্যায় কার্য্যেই ডুবিয়া মরিতেছি। আমাকে মা এখানে ফেলিয়া রাখিয়া আর বেশী শাস্তি দিও না। তোমার চরণ আমার বুকের উপর পাতিয়া দাও। আমার হাতে যে সমস্ত কাজের ভার দিয়াছিলে, সে সমস্তই ফিরাইয়া লও। আমি তোমার নিতান্ত অকেজো সন্তান। আমি আর কিছু চাহি না—নিত্যকাল তোমার চরণপূজার অধিকারটুকু চাই।

৮৫। হীরকে কলঙ্ক।

মা! তোমার কোলে আমি যখন জন্মগ্রহণ করিলাম, তখন জগতে কি আনন্দধ্বনিই উঠিয়াছিল! এমন সন্তান তোমার কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তোমাকে লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তোমার মত জননীর গর্ভে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই যে এই প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারিল, সে কথা একটীবারও কেহই ভাবিয়াই দেখিল না। তুমি যে আমার অন্তরে একটা হীরার টুকরো বসাইয়া দিয়াছ, তাহারই জ্যোতিতে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর তাহারই একটুখানি অংশ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা কেহই একবারও ভাবিয়া দেখিলই না। সংসারে আসিয়া খেলা করিতে করিতে বাড়িয়া চলিলাম, কোথা হইতে একটুকরো কাদা আসিয়া তাহার একদিকটা ঢাকিয়া ফেলিল। কত চেষ্টা করিলাম, সে কাদা সম্পূর্ণ উঠাইতে পারিলাম না; যে স্থানের কাদা উঠাইলাম, কত চেষ্টা করিলাম, সে স্থানেরও দাগটা নির্ম্মূল করিতে পারিলাম না। সংসারের পথে যতই অগ্রসর হই, ততই মাঝে মাঝে কোথা হইতে যে কাদার ঝাপটা আসিয়া পড়ে, বুঝিতে পারি না। এই প্রকারে তিলে তিলে সেই হীরের টুকরোর প্রায় সকল দিকটাই কাদায় গেল ভরিয়া; কেবল মাঝে মাঝে এক আধটু স্থান দৈবাৎ কাদার ছিটা থেকে বাঁচিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে হীরা বলিয়া চেনা যাইতেছে। মা! জীবনের এই শেষভাগে সমস্ত সংসার যখন ঘুরিয়া আসিয়াছি, তখন তোমার চরণে দাঁড়াইয়া যখন সেই হীরাখানি তোমার হস্তে ফিরাইয়া দিতে গেলাম, তখন তাহার এই কর্দ্দমাক্ত অবস্থা দেখিয়া আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া গেলাম। দাগগুলি মুছিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। এখন তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি ছাড়া উহার কলঙ্কচিহ্ন আর কেহই তুলিয়া দিতে পারিবে না। জননী! আমি যাহা ভালভাবে রাখিতে পারিব, তাহাই আমাকে দিও! যাহা দিতে হয় দিও, যাহা না দিবে দিও না, কিন্তু তোমার স্নেহপ্রেম হইতে আমাকে তিলেকের জন্য বিচ্যুত করিও না।

৮৬। দাঁড়াও।

মা! যে মূর্ত্তিতে তুমি আমার নিকট দেখা দিলে, সেই মূর্ত্তিতে কিছুক্ষণ দাঁড়াও—আমি প্রাণ

ভরিয়া দেখিয়া লই। তোমার ঐ শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তি তোমার চক্ষের ঐ মধুর অভয়প্রদ ভাব আমার প্রাণে শ্রদ্ধাভক্তির কি যে তরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহা একমাত্র তুমি জান। দাঁড়াও—দাঁড়াও—অনন্তকাল তুমি ঐ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াও আর আমি নিরবধি উহারই উপর স্থির দৃষ্টি রাখি। অনন্ত—অনন্তকাল আমার দৃষ্টি যেন তোমার দৃষ্টিতে সন্নিবদ্ধ থাকে। আমিও যেন তোমার ঐ শান্তস্নিগ্ধ ভাবের এতটুকুও লাভ করি। আমার শয়নে স্বপনে, জাগরণে বিহরণে তুমি ঐ মূর্ত্তিতেই আমাকে দেখা দিও। তোমার ঐশ্বর্য্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তি অপেক্ষা ঐ শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তিই আমার বড় ভাল লাগে। আমি এই ক্ষুদ্র কুটীরেই আছি, বেশ আছি। এখানে থাকিয়াই তোমাকে পাইয়াছি, তাই এই কুটীরখানিই আমার বড় প্রিয়। আমি কুটীরখানি সুমার্জ্জিত রাখিব, আর তুমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে আদর করিবে, তোমার মঙ্গলহস্তে আমার মস্তকে সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ দিবে। আমি তোমাকে নমস্কার করিব। ইহাই আমার নিত্যখেলা হইবে। আমার পূজা সাঙ্গ হইলে যখন তুমি তোমার কার্য্যে চলিয়া যাও, তখনই আমার হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে থাকে; আশঙ্কা হয়, কি জানি যদি তুমি আমার তুচ্ছ পূজা গ্রহণের জন্য আর ফিরিয়া না আস। জননী! দেখো, আমায় আশীর্ব্বাদ দাও, বল ও শক্তি দাও, যেন তোমার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ না করি, বিপথে না যাই। আমার সেই ভয়ই বড় ভয়—পাছে ভুল করিয়া বিপথে গিয়া পড়ি। তোমার মত এমন মা কে কবে পাইয়াছে, আর কে পাইতে পারেই বা? তুমি যখন আমার ঘরে আস, তখন চারিদিক হইতে সুগন্ধের মলয় বায়ু বহিয়া আসে। আজ কি জানি কেন, আমার প্রাণটা বড়ই হালকা মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছ; আমি তোমার চরণে যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, মনে হইতেছে, সে সমস্তই ক্ষমা করিয়াছ। মা, আমি তোমাকে আর কি দিব? তোমার চরণে মাথা রাখিয়া মুখ লুকাইয়া দুদণ্ড প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে চাহি, আর সেই অশ্রু দিয়া তোমার ঐ চরণ ধুইয়া দিতে চাহি। সুখ দাও, দুঃখ দাও, আমি তোমাকে আর কিছুই বলিব না। আমি জানি তুমি আমার মঙ্গলবিধান করিবে। জননী! আমার প্রতি চিরকাল সুপ্রসন্ন থাকিও এবং তোমারই প্রদত্ত আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে তোমার স্থান চিরতরে সুনির্দ্দিষ্ট রাখিও।

ভয় ও বিশ্বাস।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বহির্জ্জগতে যে নানাপ্রকার অমঙ্গল আছে সেই সকল অমঙ্গলকে ভয় করি বটে, কিন্তু ভয় জিনিষটা ত বাহিরের বস্তু নয়, ভয় ত মানুষের অন্তরে। যত রকমের অমঙ্গল আছে সেগুলি বাস্তবিক যত ভয়ানক, আমাদের কাছে সেগুলি তাহার অপেক্ষাও অনেক অধিক ভয়ানক বলিয়া লাগে। যে বিপদ এখনও আসে নাই মনশ্চক্ষে তাহার সম্ভাবনা দেখিয়াই আমরা আকুল হই। যে যন্ত্রণা অতি অল্পকাল-স্থায়ী তাহারই ভয়ে আমরা সারাজীবন কম্পিত হই। ইতর প্রাণীরা মৃত্যুকালে কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করে সত্য, কিন্তু মানুষের মত সুস্থ অবস্থায় ভবিষ্যতে মৃত্যুর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভয়ে বিহ্বল হয় না। যাহা চাই পাছে তাহা না পাই, পাছে আশায় বঞ্চিত হই, পাছে যাহাদের ভালবাসি তাহাদের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, পাছে বা তাহাদের হারাই, এই সকল ভয়ে মানুষ আকুল।

ইতর প্রাণীদের অপেক্ষা মানুষ যে কতগুণে শ্রেষ্ঠ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতাই মানুষের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের কারণ। যদি আমাদের আত্মজ্ঞান ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি না থাকিত তবে আমাদের এত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও থাকিত না। যদি মানবঅন্তরে প্রেম না থাকিত তবে মানবজীবনে শোকও স্থান পাইত না। যদি মানবহৃদয়ে বিবেক না থাকিত তবে মানুষকে লজ্জা ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইত না। এই সকল সন্তাপ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গকে স্পর্শও করে না। যে সকল শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে বলিয়া মানুষ ইতর প্রাণীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সেই সকল শক্তি ও প্রবৃত্তিই মানুষকে নানাপ্রকার সন্তাপের অধীন করিয়াছে। বিধাতা মানুষকে মহোচ্চ অধিকার দান করিয়া তাহারই সহিত বহুবিধ দুঃখকষ্টকে গ্রথিত করিয়াছেন।

তথাপি আমরা এ কথা কিছুতেই বলিতে পারি না যে এই অধিকার না থাকিলেই ভাল হইত। সত্য বটে যে যাহা লইয়া মানুষের শ্রেষ্ঠতা সেই সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তিই মানুষের ভয় ও উদ্বেগ, শোক ও অনুতাপের মূল; কিন্তু আবার সেই সকল শক্তি ও প্রবৃত্তিই মানুষকে স্বর্গীয় শান্তি দান করে। যে জ্ঞান-বুদ্ধি আমাদিগকে বলে যে জীবনে সকলই চঞ্চল, সকলই নশ্বর, সকলই মৃত্যুর অভিমুখে ছুটিয়াছে, সেই জ্ঞান-বুদ্ধিই যিনি নিত্য ও নির্ব্বিকার তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে। মানবঅন্তরে যে স্নেহপ্রেম আছে বলিয়া আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু এত শোকের ব্যাপার হইয়াছে, সেই স্নেহপ্রেমই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে দেহের বিনাশে আত্মা বিনষ্ট হয় না এবং পৃথিবীতে যাহাদের হারাইয়াছি তাহাদের চিরদিনের মত হারাই নাই। যখন আমরা কোন দুষ্কর্ম্ম করি, তখন বিবেকের ধিক্কার ভোগ করি বটে, কিন্তু বিবেকই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, সে কোন্ আলোক, যাহার অভাবে হৃদয় এরূপ অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। এইরূপে মানুষের যে সকল বিশেষ শক্তি মানুষকে গভীর শোকসন্তাপে নিক্ষেপ করে, সেই সকল শক্তিই পরমাশ্চর্য্যরূপে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে। এই সকল শক্তি আমাদিগকে শোক-সন্তাপের ভিতর দিয়া ভগবচ্চরণে লইয়া যায়। ভয়ের প্রতিকাররূপে ভগবান আমাদিগকে ধর্ম্মবিশ্বাস দান করেন। জীবনের প্রভু যিনি তাঁহার উপরে নির্ভর করিলে মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয় এমন আর কিছুতেই নহে।

যিনি বিশ্বাসী তিনি বাস্তবিক ভয়ের অতীত। কিন্তু মানুষের জীবন সাধারণতঃ যে সকল আপদবিপদের অধীন সে সকল আপদবিপদ যে তাঁহার জীবনে আসিবে না, তিনি এমন আশাও করেন না, কামনাও করেন না। যে মহামারীতে দেশ একেবারে উচ্ছন্ন যাইতেছে, সে মহামারী যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে এমন বর তিনি কামনা করেন না। যে অলক্ষ্য বাণ অন্ধকারে আসিয়া শত সহস্রজনকে ধরাশায়ী করিতেছে, সে বাণ যেন তাঁহার গায়ে না লাগে এমন দুর্ভেদ্য কবচ তিনি প্রার্থনা করেন না। যখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জলিয়া যাইতেছে তখন তাঁহার ক্ষেত্রে প্রচুর বৃষ্টিপাত হোক ইহাও তাঁহার কামনার বিষয় নহে। তাঁহার জীবনে যেন কোনরূপ আপদবিপদ দুঃখকষ্ট বা প্রলোভন না আসে, আর যদিই বা আসে ভগবান যেন সেগুলিকে অলৌকিক উপায়ে নিজে দূর করিয়া দেন—এমন প্রার্থনাও তিনি করেন না। ভক্ত মনে করেন যে নিজের জন্য সাংসারিক কোন বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করা লজ্জার কথা, এবং এরূপ কোন বিশেষ সুবিধা লাভ করিবার আশা করিলেও অধর্ম্ম হয়। বিশেষ অধিকার মাত্রেই মানুষকে সর্ব্বসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করে। বিশ্বাসী জানেন যে সমগ্র মানবপরিবার একটী অখণ্ড ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং কোনরূপ বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা, কোনরূপ বিশেষ অধিকার যাহা হইতে সাধারণে বঞ্চিত —নিজের জন্য এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করিলে এই বিরাট ভ্রাতৃমণ্ডলীর নিকট বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হয়। পরম পিতা যাহা বিধান করেন তাহাই বিশ্বাসী মঙ্গল বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন। তিনি সেই পিতার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া সাংসারিক সুখ-সৌভাগ্যরূপ কোন মূল্য প্রার্থনা করেন না। সাধারণ লোকের জীবনে যেমন দুঃখকষ্ট আপদ-বিপদের সম্ভাবনা বিশ্বাসীর জীবনেও সেইরূপ; সাধারণ লোকের ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার ও অনিশ্চিত ভক্তের ভবিষ্যতও ঠিক সেইরূপ অন্ধকার ও অনিশ্চিত। কিন্তু তিনি অন্ধকারেই থাকিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ জানিবার জন্যও তিনি উদ্বিগ্ন নহেন। তিনি যে সকল রহস্য ভেদ করিয়াছেন, সকল সংশয় ছেদন করিয়াছেন, বিশ্বের সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাও নহে; তথাপি তিনি ভগবানের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাসী এবং সেই বিশ্বাসের বলেই তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। নীরব ধ্যান এবং ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল। ভগবানের ইচ্ছাকেই তিনি মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়াছেন। সাধারণ লোক হইতে এই তাঁহার মহা প্রভেদ।

বুদ্ধির আলোকে কোন তত্ত্ব নির্ণয় করার নাম জ্ঞান, আর প্রেমের আলোকে কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়ার নাম বিশ্বাস। জ্ঞান জগতের একএকটী ঘটনা লইয়া আলোচনা করে, আর যাহা নিত্যসত্য তাহাই বিশ্বাসের অবলম্বন। জ্ঞান যেন প্রকৃতিরূপ মহাকাব্যের এক-একটী শ্লোক লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে, আর ঐ মহাকাব্যখানিকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখাই যেন বিশ্বাসের লক্ষ্য। প্রকৃতিকে কত সময়ে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিয়া লাগে, কত সময়ে প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ভয়ে বিহ্বল হই। প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে যে ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় আছে তাহা আমরা ধরিতে পারি না, তথাপি জ্ঞান বলে যে, মোটের উপরে জগৎ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। বিশ্বাস বলে, জগতের সকলই মঙ্গল, ভগবানের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই থাকিতে পারে না। এই মঙ্গলভাবের গভীরে ডুবিয়া গিয়া সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বিশ্বাসী ভুলিয়া যান।

ঝড় বৃষ্টি মেঘ ও বজ্রবিদ্যুতের উপরে নির্ম্মল আকাশ আছে এবং সেই আকাশে চিরস্থির চিরস্নিগ্ধ নক্ষত্র-রাজী ফুটিয়া আছে একথা যেমন সত্য, জীবনের দুঃখ-কষ্টের পশ্চাতে সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলা ও মঙ্গল প্রচ্ছন্ন আছে একথাও তেমনি সত্য। এই অসীম বিশ্বে মানুষ যে কত ক্ষুদ্র এই কথা চিন্তা করিলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অবসন্ন হইয়া যায় এ কথা যেমন সত্য, অপর দিকে এই ক্ষুদ্রতার জ্ঞানই বিশ্বাসীকে বলে যে তিনি অনন্ত-স্বরূপের আশ্রিত। বিশ্বাসী যখন বিপদসাগরে ভাসিয়া যান তখন তিনি জানেন যে তিনি নিতান্ত একেলা নহেন। তিনি ঈশ্বরচরণে মাথা রাখিয়া বলেন, "হে প্রভু, তুমিই আমার রক্ষক, তুমিই আমার আশ্রয়!" বিশ্বাসী জানেন যে আকাশের চন্দ্রসূর্য্য মুছিয়া যাইতে পারে, তথাপি ঈশ্বরের প্রেমদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর হইতে বিচলিত হইবে না। তিনি জানেন যে মৃত্যুর যন্ত্রণা অমৃতধামে জন্মলাভের বেদনা মাত্র। বিপৎকালে বাহ্যিক ধৈর্য্য দেখান খুব কঠিনও নয় খুব বিরলও নয়; কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসী ব্যতীত অন্তরে প্রকৃত শান্তি ও নিশ্চিন্তভাব রক্ষা করা অপরের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও হয়। বিপদ ভক্তকে দৃঢ়তর বন্ধনে ভগবচ্চরণে বাঁধিয়া দেয়।

কিন্তু প্রকৃতি যদি গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিত—"হে দুর্ভাগ্য মানব, ভগবান যে তোমার রক্ষক ও আশ্রয়, এ কেবল তোমার কল্পনা; তুমি নিয়তির খেলার পুতুল মাত্র!" বজ্র যদি বিদ্যুতের অক্ষরে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের বক্ষে লিখিত—"এ জগৎ অরাজক; ঈশ্বর নাই; তাঁহার মঙ্গলবিধান তোমার কুসংস্কার মাত্র; তোমার উপরে কেহ নাই—তুমিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ!" তবে আর ভক্তের দাঁড়াইবার ভূমি থাকিত না, তাহার নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় ভাব নিরাশায় পরিণত হইত।

ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস থাকিলে মানুষ যেমন প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হয় না, ভগবানের ন্যায়বিধানে বিশ্বাস থাকিলে মানুষ তেমনি পাষণ্ডের ভ্রূকুটীকে তুচ্ছ করিতে পারে। অসত্য এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসী একাকী দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। দুর্জ্জনের তর্জ্জনগর্জ্জনে তাঁহার প্রসন্ন ললাট মলিন হয় না। অন্যায় আইন এবং অত্যাচারী রাজশক্তি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াও তিনিই জয়লাভ করেন। স্বার্থপর লোকদের দৃঢ়তার পশ্চাতে কেমন একটা স্পর্দ্ধার ভাব থাকে কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসীদের যে দৃঢ়তা তাহা কেমন বিনয়ের বর্ণে অনুরঞ্জিত! তাঁহাদের দৃঢ়তার মূলে যেন তাঁহাদের নিজের ইচ্ছা নহে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহারা প্রভুর আদেশকে মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা নির্ভয় কিন্তু বিনীত। ভয়ের মূলে স্বার্থনাশের সম্ভাবনা, বিশ্বাসের মূলে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।

তবে মনে হইতে পারে যে একটী বিশেষ স্থল আছে যেখানে ধর্ম্ম মানুষকে নির্ভয় না করিয়া ভয়ে অভিভূত করে—মানুষ পাপ করিয়া ভগবানের নাম করিতে ভয় পায় এবং তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চাই না, তাঁহার নিকট হইতে পলাইবার চেষ্টা করি না, কিন্তু আমরা আমাদের নিজের নিকট হইতেই পলাইবার বৃথা চেষ্টা করি। তাঁহার নিকটে যাইতে আমাদের লজ্জা করে। তিনি আমাদের ক্ষমা করিতে প্রস্তুত এবং তাঁহার নিকটে গেলে তিনি আমাদের গ্রহণ করিবেন বলিয়া যতই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি, ততই আমরা তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইতে পারি না। মহাত্মা যীশু যে অপব্যয়ী কনিষ্ঠ পুত্রের গল্প বলিয়াছিলেন সেই গল্পটী স্মরণ করুন। সেই উদ্ধত যুবক ধনীর সন্তান; সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল ও বিদেশে গিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সমুদয় টাকাকড়ি নষ্ট করিয়া ফেলিল; অবশেষে তাহার এমন দুর্দ্দশা হইল যে শূকর চরাইয়া এবং শূকরের উচ্ছিষ্ট খাইয়া অতি কষ্টে সে দিনপাত করিতে লাগিল। কষ্ট যখন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে ভগ্নপ্রাণে বৃদ্ধ পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল। পিতা তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া পরম স্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হারাণ সন্তান ফিরিয়া আসিয়াছে, মৃত সন্তান বাঁচিয়া উঠিয়াছে বলিয়া গৃহে মহা উৎসবের আয়োজন করিলেন। তখন অনুতপ্ত যুবক বলিল, "পিতা আমি তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য, কিন্তু তোমার ভৃত্যদের সঙ্গে থাকিতে আমাকে একটু স্থান দাও।" কিন্তু যদি সেই হতভাগ্য যুবক গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শুনিত যে তাহার পিতা আর পৃথিবীতে নাই, তবে কি তাহার বড় আনন্দ হইত? সে যে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে পারিল না, সে যে তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পাইল না—সে দুঃখ তাহার কি ভারী দুঃখ হইত! বুঝি বা সারাজীবন অশ্রুপাত করিয়া সে দুঃখ তাহার ঘুচিত না। যে মহাপাপী ঈশ্বরের মুখের দিকে চক্ষু তুলিতে পারিতেছে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর "ভগবান না থাকিলে কি ভাল হইত?" সে নিশ্চয়ই উত্তর করিবে "ও কথা বলিও না!" লজ্জায় যে তাঁহার দিকে চাহিতে পারে না সেও জানে যে তাঁহার থাকার অপেক্ষা না থাকা অনন্ত গুণে অধিক ভয়ানক হইত। ভগবান যে পুণ্যময় এই বিশ্বাস

তাহাকেও রক্ষা করে। যে নিরাশায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে সে-ও ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তাঁহারই করুণার উপরে দাঁড়াইবার ভূমি পায়। পাপী তাঁহাকে ভয় করে সত্য কিন্তু তিনি ভিন্ন পাপীর ত অন্য গতি নাই। বিশ্বাসেই মুক্তি, বিশ্বাসেই ভয় হইতে পরিত্রাণ। পাপীর রাত্রি যতই দীর্ঘ ও যতই অন্ধকার হউক না কেন, পুণ্যময়ের উদয়ে সে রাত্রির অবসান হইবেই হইবে। তবে যাহারা ভয়ে ভীত তাহারা সাহস অবলম্বন করুক। পাপে তাপে যাহারা মলিন তাহারা তাঁহারই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করুক। তবে আমরা এই কথাই বলি "তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি—আমরা তোমাকে ভয় করিব না।"

জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। জীবনের উদ্দেশে কি, ইহাই মূল প্রশ্ন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই পৃথিবীতে আমরা কেন আসিলাম, এবং এই ধরণীপৃষ্ঠে কিছুকাল বাস করিয়া নানাবিধ ছন্দে ভঙ্গে আত্মজীবন প্রকাশ করিয়া কেনই বা অদৃশ্য অজানা ক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইয়া যাই—এই প্রশ্ন বোধ হয় আমাদের, প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে সমুদিত হয়। এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, প্রত্যেক মানবই তাহার সমাধানে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু উহার কোনই কূলকিনারা না পাইয়া হতাশহৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

২। মূল প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন—দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি?

মানুষমাত্রেই সুখ চায়, দুঃখ তাহার প্রার্থনীয় নয়। এই কারণে জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্ন করিলেই তাহার ভিতরে অন্তঃপ্রবাহিতরূপে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া দেখা দেয়—দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি? আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া কি উপায়ে সুখলাভ হইবে, কোন্ প্রণালী অনুসরণ করিলে আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ অশান্তি বিদূরিত হইয়া শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষ নিজের কর্ম্মফলে অশান্তি টানিয়া আনিলেও সে অশান্তির মধ্যে বাস করিতে এতটুকুও ভালবাসে না—শান্তিলাভের জন্য সে সর্ব্বদাই হা-হুতাশ করিতে থাকে। এই কারণে জীবনের উদ্দেশ্যবিষয়ক প্রশ্নের মধ্যে আর একটি প্রশ্ন সর্ব্বদাই উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে যে, মানুষের জীবনে অশান্তি ঘুচিয়া গিয়া কি উপায়ে শান্তিরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩। দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত বাণী।

আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাই যে, মানবজীবনের কি অন্তরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সুখ ও দুঃখের, শান্তি ও অশান্তির, আনন্দ ও নিরানন্দের, আশা ও নিরাশার কঠিন সংঘর্ষমূলক দ্বন্দ্ব অবিরাম চলিতেছে। যজ্ঞাগ্নির ভিতর হইতে যজ্ঞদেবতা যেমন মঙ্গল চরুহস্তে আবির্ভূত হন, সেইরূপ দ্বন্দ্বের ভিতর হইতে মঙ্গলময় ভগবান এই মঙ্গলবাণী লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন যে, দ্বন্দ্বের অতীত হও, তোমার সকল দুঃখ ও সকল দৈন্য অন্তর্হিত হইবে, এবং নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি ও নিত্য আনন্দ তোমার হস্তগত হইবে।

৪। দ্বন্দ্ব উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ।

দ্বন্দ্ব সমুপস্থিত দেখিলেই আমাদের মনে স্বভাবত এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, এই দ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল? কেনই বা আসিল? আর কিরূপেই বা তাহার নিবৃত্তি হইবে? এই দ্বন্দ্ব কেনই বা আসিল আর কোথা হইতেই বা আসিল, মানবের অন্তরে এই গুরুতর প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত নিরাকরণ মানুষ আজও করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানি না এবং কখনও করিতে পারিবে কিনা তাহাও সন্দেহ। নিরাকরণ করিতে না পারিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে, এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই আমরা উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হই। বলিতে কি, দ্বন্দ্বই আমাদিগকে উন্নতি ও কল্যাণের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলে।

৫। দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষে নিহিত।

এই দ্বন্দ্ব মানুষ স্বয়ং আনয়ন করে নাই। আমরা জন্মাবধি দ্বন্দ্বময় প্রকৃতির মধ্যে লালিতপালিত হই, পরিবর্দ্ধিত হই। এমন কি, মানুষের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বাবধি তাহার সুখের কারণের ন্যায় দুঃখের কারণও, সুতরাং তাহাদের উভয়ের সংঘর্ষজনিত দ্বন্দ্বেরও কারণ প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। কাজেই মানুষ প্রকৃতির অতীত না হইলে একথা কিছুতেই বলিতে পারে না যে, দ্বন্দ্ব কেন—কি কারণে আসিল? একমাত্র প্রকৃতির অতীত যিনি, সমস্ত প্রকৃতি যাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া যাঁহা দ্বারা নিঃশ্বসিত হইয়াছে, একমাত্র প্রকৃতির সেই অনাদি কারণ মঙ্গলময় পরম পুরুষই বলিতে পারেন যে কেন, কি কারণে, বা কি উদ্দেশ্যে তিনি মানবের অন্তরে ও বাহিরে সুখ ও দুঃখের, শান্তি ও অশান্তির বিধান করিয়া দ্বন্দ্বের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, দুঃখ-অশান্তি প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া, উহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহাদের

উপর উঠিবার ফলে দ্বন্দ্বকে বিনষ্ট করিলে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই আমরা উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতালাভের অধিকারী হই।

৬। দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভের অনন্য উপায়, ভগবৎচরণে আত্মনিবেদন।

কিন্তু আমাদের সম্মুখে এই সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারে আসিয়া দেখা দেয় যে, এই দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? এই দ্বন্দ্বকে বিনষ্ট করিবার উপায় কি? কি উপায়ে, কি প্রকার সাধন অবলম্বন করিলে দ্বন্দ্বের হস্ত অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিব? আমরা যখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে নামিয়া পড়ি, তখন আমাদিগকে বড় অশান্তি ভোগ করিতে হয়। সেই অশান্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠি, এবং তাহার নিবৃত্তির উপায়ের ইঙ্গিত পাইবার জন্য আত্মা ভগবানের চরণে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়া যায়। তখন সে বুঝিতে পারে যে, শরণাগতবৎসলের চরণে শরণাগত হওয়া এবং সকল উন্নতির ও মঙ্গলের একমাত্র নিদান সেই ভগবানের চরণে সুখ ও দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ, শান্তি ও অশান্তি, আশা ও নিরাশা, আনন্দ ও নিরানন্দ, এক কথায় সমস্ত জীবন নিবেদন করিয়া দেওয়াই দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের অনন্য উপায়।

৭। সীমার মধ্যে জন্মলাভই দ্বন্দ্বের কারণ।

সেই সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবার বিনিময়ে আত্মবিশ্লেষণ করিবার উপযোগী যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়, সেই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানুষ তখন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পায় যে, সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কারণেই শতবিধ দ্বন্দ্ব তাহার পার্শ্বচর হইয়া তাহাকে পীড়া দিতে সক্ষম হইতেছে। সীমাবদ্ধ হইবার কারণেই মানুষ সকল সময়ে সকল বিষয়ে খাঁটি সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারে না; তখন স্বভাবতই তাহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তখন মানুষের জীবনে সত্যের সহিত মিথ্যার সংঘর্ষজনিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। মিথ্যা যতই বড় হয়, দ্বন্দ্বের আঘাতের বেগও ততই কঠিন হয়। সুতরাং ইহা সহজেই আমাদের উপলব্ধিতে আসিবে যে, আমাদের জীবনপরিধি সীমার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া যতই প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং আমরা যতই সত্য পথের পথিক হইয়া মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব, আমরা ততই দ্বন্দ্বের হাত অতিক্রম করিতে পারিব, এবং দ্বন্দ্বের আঘাতও ততই লঘু হইতে লঘুতর হইতে থাকিবে।

৮। প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বের নিত্য খেলা।

খাঁটি সত্যকে ধরিয়া থাকিলে দ্বন্দ্বের কোনই কারণ থাকে না। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া অনেক সময়ে সেই খাঁটি সত্যকে ধরিতে পারি না বা ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের কি অন্তরে কি বাহিরে ঘটনাপরম্পরা এবং চিন্তা ও ভাবলহরী এতই তড়িৎবেগে আসে আর চলিয়া যায় যে, অনেক সময় তাহার মধ্য হইতে মিথ্যাটুকু বাছিয়া লইয়া পরিহার করা এবং সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করা বড়ই দুরূহ হয়। যেমন কোন বস্তুর গভীর প্রদেশে নিবদ্ধ লৌহকে বাহিরে আনিবার জন্য চুম্বকের সাহায্য আবশ্যক হয়, সেইরূপ আমাদের অন্তরের চিন্তা ও ভাবসমূহের এবং বাহিরের ঘটনাপরম্পরার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকুকে বাছিয়া লইবার জন্য আমাদের অন্তরে সত্যস্বরূপ ভগবান্ যে সকল সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল সত্যের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমরা যখন আমাদের চতুর্দ্দিকে নয়ন মেলিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, আমাদের পরিপার্শ্বে দ্বন্দ্বসমূহের এক মহা খেলা নিত্যই চলিতেছে—সকলই যেন অনিত্য, কিছুরই যেন স্থিরতা নাই—জীবন ও মৃত্যু, ঠেলাঠেলি ও মারামারি, ক্ষণিক সুখ ও দুঃখ-ভোগ সংসারক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে। আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি যে, নানাবিধ দ্বন্দ্বসমূহের ভয়াবহ আবর্ত্ত আমাদিগকে বিনাশের মুখে ফেলিবার জন্য ভীষণ বলের সহিত আকর্ষণ করিতেছে।

৯। আত্মনিবেদনের ফলে দিব্যদৃষ্টি-লাভ।

এইপ্রকার আবর্ত্তের স্রোতে পড়িয়া যখন মানুষ আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে, যখন সে আত্মরক্ষার আর কোনই উপায় খুজিয়া পায় না, তখন তাহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। সত্যধর্ম্মা পরম পুরুষের সত্য বিধানে তাহার নয়নের সম্মুখে সত্য আসিয়া ধরা দেয়। তখন সে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করে যে, দ্বন্দ্বসমূহের এত পরাক্রম, এত বল, এত শক্তি, এ সমস্তই সত্যের অপ্রতিহত শক্তির নিকটে মিথ্যা মরীচিকা মাত্র। সে তখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করে, এই প্রকৃতির মধ্যে এবং আমাদের আত্মাতে যে সকল বিখণ্ডিত সত্য দেখা যায়, সে সকলেরই মূল একমাত্র নিত্য সত্য ভগবান—যাঁহার অপ্রতিহত শক্তি ও সত্য নিয়মসমূহের দ্বারা এই বিশ্বজগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং নিজের কর্ম্মচক্র সংরচন করিয়া চলিতেছে। তিনিই একমাত্র সর্ব্ববিধ সীমার অতীত—কোন প্রকার সীমাই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না; কোন প্রকার দ্বন্দ্বই

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত। মানব যদি দ্বন্দ্বের হস্ত অতিক্রম করিতে চায় এবং নিত্য সুখ শান্তি ও আনন্দলাভের প্রয়াসী হয়, তবে তাহাকে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, মিথ্যা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। সকল বিষয়ে, কি কথায় কি কাজে, সে যতই সত্যকে ধরিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, ততই তাহার জীবনের পরিধিও সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে, এবং সীমার সঙ্কীর্ণতাও ঘুচিয়া যাইতে থাকিবে; তখন দ্বন্দ্বসমূহও ক্ষীণ হইতে ক্রমশ ক্ষীণতর হইবে এবং উহাদের আঘাতও ক্রমশ লঘু হইতে লঘুতর হইতে থাকিবে।

১০। সত্যের বলে দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভ।

সে তখন সত্যের অমিত বলে বলীয়ান হইয়া এবং মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে নবজীবন লাভ করিয়া সহজেই দ্বন্দ্বসমূহের পাশজাল কাটিয়া মুক্তিলাভ করে ও অন্তরে অনুপম শান্তি প্রাপ্ত হয়। তখন সে বুঝিতে পারে, সত্যেই সুখ, সত্যেই শান্তি। এই কারণে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সাধক সত্যেরই সন্ধানে আপনাকে নিয়োগ করেন। সত্যই একমাত্র চিরস্থায়ী, সত্যেরই বিনাশ নাই।

১১। সত্যলাভের উপায়, সত্যস্বরূপকে জানা।

সত্যকে জানিতে গেলে, আমরা জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই যিনি বিশ্বজগতকে সত্য নিয়মসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং আমাদের জন্মগ্রহণের পরে যিনি আমাদের অন্তরে সত্য নিয়মসমূহকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই জানিতে হইবে। তিনি সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সকল চেতনের মধ্যে তিনিই একমাত্র নিত্য চৈতন্যস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। তিনিই আমাদের শরীরে বল, মনে শুভবুদ্ধি ও জ্ঞান এবং আত্মাতে তাঁহাকে জানিবার অধিকার ও ক্ষমতা নিত্যই প্রদান করিতেছেন। এইপ্রকারে তাঁহাকে বিশ্বজগতের এবং আমাদের আত্মার মঙ্গলময় বিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়াই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। অনন্তস্বরূপ পরম পুরুষ ভগবান যে আছেন, এবং সমস্ত প্রকৃতি যে তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতেই পারে না, ইহা জানাই হইল সকল জ্ঞানের সার এবং সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ সত্য।

১২। পরমাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে প্রীতিযোগ।

প্রত্যেক মানবাত্মা এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি একই পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরা আমাদের আত্মাকেও সম্প্রসারিত করিতে পারি; তখন আমরা দেখিতে পাই যে, কি অন্তর্জগৎ কি বহির্জগৎ সমস্তই এক অনির্ব্বচনীয় অবিচ্ছেদ্য প্রীতিসূত্রে ও সত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তখন সকলের মধ্যে ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মার ভিতর দিয়া প্রবেশ করা খুবই সহজ হয়, তখন আমরা স্বভাবতই আপনাকে হারাইয়া ফেলি এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যাই। এই কারণে সাধকদিগের উপদেশ এই যে, সত্যকে জানিতে হইলে বিশ্বের আত্মা পরমাত্মার সহিত মানবাত্মাকে বিলীন করিয়া দিতে হইবে; আপনাকে "বিনাশ" করিয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া পরমাত্মাতে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।

১৩। সত্যস্বরূপকে জানা দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভের কারণ।

সত্যের বিনাশ নাই। অবিনাশী সত্যকে যিনি উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারই বা বিনাশ কোথায়? তাঁহারও বিনাশ নাই। তাঁহারও মৃত্যু নাই। তিনি জীবনসাগরে নিত্যই বিচরণ করেন। আমরা ইহলোকে দেখি যে, ছোট বড় যত কিছু দুঃখ আছে সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে। সত্য যিনি উপলব্ধি করেন তাঁহার মৃত্যুও নাই এবং দুঃখও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি নিত্য সুখের অধিকারী হন এবং নিত্য শান্তি তাঁহাকে আশ্রয় করে। আমরা যখন আমাদের শাশ্বত প্রতিষ্ঠাভূমি ভগবানকে ভুলিয়া জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে, প্রত্যেক মানবাত্মাকে এবং প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে ও তাঁহা হইতে পৃথকরূপে অবস্থিত দেখিতে প্রয়াস পাই, তখনই আমরা দ্বন্দ্বরাশির মধ্যে প্রবেশ করি এবং সুখশান্তি হারাইয়া বসি।

১৪। আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতেই জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধন-তত্ত্বের উপলব্ধি।

আমাদের আত্মা যেমন আমাদের দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এবং আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মনের প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে, প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে ও প্রত্যেক ধ্যানের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত করে, এই বিশ্বের আত্মা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অতীত হইলেও তাহার প্রত্যেক অংশে এবং তাহার অন্তঃস্থিত মানবাত্মার প্রত্যেক অংশে সমগ্রভাবে অবস্থিতি করেন। এই আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চাহিলে, কূর্ম্ম যে প্রকার তাহার অঙ্গসমূহকে বাহির হইতে কিরাইয়া আনিয়া অন্তরে নিবিষ্ট রাখে, সেইরূপ আমাদের

আত্মাকে বহির্বিষয়সমূহ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। এইরূপে অন্তর্মুখী হইলেই, আত্মা তাহার অন্তরাত্মা পরমাত্মার সহিত আপনাকে একাত্ম-যোগে যুক্ত করিয়া মিশাইয়া ফেলিলেই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যসকল সমুদ্ঘাটিত হইবে। আমাদের জন্মাবধি আমাদের আত্মাতে পরমাত্মা যে সকল অবিনশ্বর সত্য জ্বলদক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সত্যের সাহায্যে আমরা তাঁহার চরণস্পর্শলাভের অধিকার ও ক্ষমতা ধারণ করি, সেই সকল সত্য আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য বলিয়া কথিত হয়। এই সকল সত্যের ভিতর দিয়াই ভগবানের বাণী মানবাত্মার অন্তরে ধ্বনিত হয়। তখন তাহার অন্তরে জীবনের উদ্দেশ্য এবং তৎসাধনসম্বন্ধীয় সকল তত্ত্বই শত সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়।

১৫। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে দুঃখনিবৃত্তি।

ভগবানের বাণী যিনি অন্তরে শ্রবণ করেন, তাঁহার নিকট কোনপ্রকার ভেদাভেদ থাকিতে পারে না; তিনি সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন। তিনি সেই বাণী ধরিয়া ভগবানের চরণতলে অগ্রসর হন, এবং তিনি সকল দুঃখ ও সকল অশান্তির হস্ত সহজেই অতিক্রম করেন। কোন প্রকার বিভীষিকাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি বিশ্ব-পিতা ও অখিলমাতার ক্রোড়ে নির্ভয়ে অবস্থিতি করেন। পরমেশ্বর তাঁহার হস্তে সকল কার্য্যের ভার প্রদান করেন; সুখ ও দুখ, লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয়ের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি সমস্ত কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হন। ভগবানের মঙ্গল বিধানে হইতেই তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পায় এবং তিনি জনসাধারণের হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।।

("সমাচার-দর্পণ" হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।)

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

"এতদ্দেশীয় মাজিস্ত্রেট।—হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্ত্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাড়ুয্যে রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কওয়াসজি।"

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা।—ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসর-পর্য্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবন্ত ধনী মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এবং শুনা গেল যে, বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন তাহাতে এডুকেশন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকট অতিবাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

কথিত আছে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি ঐ টাকাতে মুদ্রা বা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া না দিয়া নগদ পুরস্কার প্রদানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের অর্থাভাবে স্বর বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হওনের আবশ্যক হইত তাঁহারা ঐ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ থাকিতে পারিবেন।

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

"টগ সমাজের মুনাফা।—আমাদের ইচ্ছা যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিতেছে। ঐ জাহাজ মাকিণ্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি ৩০ এপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে

দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস যে হরণ হইয়াছে।"

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

"এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব্ব বদান্যতা।—গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিস্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন ব্যক্তিরদের আহার নির্ব্বাহ হয় এতদর্থ ঐ টাকা সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। ঐ টাকা স্বতন্ত্র জমা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ড নামে বিখ্যাত হইবে যেহেতুক এইরূপ যে মহানুভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাঁহার নাম ঐ মহাদানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে।"

(১৭ মার্চ্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪)

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার ৺প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাষ্পীয় জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতায় ঐ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে।"

(৩১ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বারাণসী হইতে কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের পূর্ব্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ব্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে বহুসংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে অন্যূন ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ॥০ এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।০ করিয়া দিয়াছেন।" *

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও আদিব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চন্দননগর)

[এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এতই অবিশ্বাস্য যে, আমরা উহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতাম না। কিন্তু যখন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোঁম্যাঁ রোলাঁ এই বিষয়টী তাঁহার গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন; শুনা যায় যে এদেশবাসীগণ উহাতে অনায়াসেই আস্থা স্থাপন করিতেছেন; এমন কি, পরমহংসদেবের এক সম্প্রদায় শিষ্যগণ আলোচ্য বিষয়টী বাদ না দিয়াই ঐ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেই কারণে বাধ্য হইয়া আমরা এই প্রবন্ধটীকে পত্রিকায় স্থান দিলাম। আমরা আশা করি, উক্ত শিষ্যগণ আলোচ্য বিষয়টী বাদ দিয়া উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন এবং ধর্ম্মসমাজের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়িতে না দিয়া শান্তিবারি বর্ষণ পূর্ব্বক পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনাদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। তঃ সং]

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজ নাকি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম ধর্ম্মসমাজের বিরুদ্ধে এরূপ মত পোষণ করা যে নিতান্ত অজ্ঞতামূলক ভ্রান্তমত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি এ বিষয় লইয়া যখন পরমহংসদেবের শিষ্যগণের মধ্যে অল্পস্বল্প আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে, তখন এবিষয়ে আমাদের দু'একটী বক্তব্য বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোঁম্যাঁ রোলাঁ তাঁহার লিখিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতে এই ভ্রান্ত কথার স্থান দিয়াছেন বলিয়াই ঐ সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যিনি রোঁম্যাঁ রোলাঁর মস্তকে এই অন্যায় ও অসঙ্গত ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্মানুরাগীর উপযুক্ত কার্য্য করেন নাই, তাহা আমরা বলিতে দ্বিধা করিব না। রোঁম্যাঁ রোলাঁ উক্ত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে রামকৃষ্ণদেব আদিব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছিলেন। কথাটা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা রামকৃষ্ণকথামৃতের চতুর্থ ভাগে বিবৃত বিবরণ হইতেই প্রকাশ পাইবে। প্রকৃত কথা এই যে তিনি কলিকাতা নন্দনবাগানস্থিত ৺কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উক্ত তারিখে এক উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উৎসবের নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকাপ্রযুক্ত রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সঙ্গী শিষ্যগণ যেরূপ আদরআপ্যায়ন পাইবার আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ আদরআপ্যায়ন গৃহকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। ইহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের কোনই যোগ ছিল না—উহা নন্দন-বাগানের গৃহস্বামীদিগের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। উহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজকে সংযুক্ত করা রোঁম্যাঁ রোলাঁর পক্ষে নিতান্ত অন্যায় ভ্রম এবং যিনি তাঁহাকে এই বিষয়ের গল্প করিয়া ইহা তাঁহার গ্রন্থে প্রবেশ করাইয়াছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এবং আদিব্রাহ্মসমাজ উভয়েরই গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিবেন। রোঁম্যাঁ রোলাঁ আরও বলিয়াছেন যে, পূজ্যপাদ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, রোলাঁ মহাশয়ের তাঁহার সম্বন্ধে উক্তি ভ্রমপূর্ণ; প্রকৃত তথ্য তিনি ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ উদারতম বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া কোন সাধু মহাত্মারই প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা কখনও প্রকাশ করেন নাই এবং করিতে পারেনও না। ভারতবর্ষের ঋষিদিগের আদর্শে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক

---

* ভারতবর্ষ—ভাদ্র, ১৩০৮।

ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার ব্রত। রামকৃষ্ণ দেব একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ; সুতরাং তাঁহার প্রতি আদিব্রাহ্মসমাজ যে কিছুতেই অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন না, তাহা বলা বাহুল্য—এরূপ উক্তি বাতুলেরই উপযুক্ত।

অবশ্য বলা বাহুল্য, আদিব্রাহ্মসমাজ কোন মানবসন্তানকেই প্রচলিত অর্থে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। এবিষয়ে আদিব্রাহ্মসমাজ রোঁলা মহাশয়ের সহিত একমত। আদিব্রাহ্মসমাজ পরমহংসদেবকে প্রচলিত অর্থে অবতার স্বীকার না করিলেও তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, ইহা আমরা বিশেষরূপেই জানি। একবার যৌবনে রামকৃষ্ণদেব মহর্ষিদেবের পুণ্য নাম শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ সেবক বাবু মথুরানাথ বিশ্বাস হিন্দু কলেজে মহর্ষির সহপাঠী ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে মহর্ষির নিকটে লইয়া যাইতে সম্মত হইয়া একদিন মহর্ষির যোড়াসাঁকোর ভবনে লইয়া আসিলেন।

প্রথম দর্শনেই এই দুই ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ দেব আপন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মহর্ষির ধর্ম্ম প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এ যুগের জনক; জনকের মত তুমিও সংসারে থেকে ঈশ্বরে ডুবে আছ"। তাহার পর মহর্ষিদেবের নিকটে বেদের ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রীত হন। অন্যপক্ষে মহর্ষিদেবও পরমহংসদেবের দিব্য ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে মাঘোৎসবে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহা হইতেই তো রামকৃষ্ণদেব ও মহর্ষিদেব উভয়ের পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। রামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগে উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবকে অসভ্য দেখাইবে বলিয়া বিনা জামা জুতায় তাঁহাকে উৎসবে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা আমরা মহর্ষিদেবকে যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি, এরূপ নিষেধ তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাঁহার সময় মাঘোৎসবে প্রবেশপত্রেরও ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং উৎসবের দর্শনার্থীগণ যিনি যে বেশে পারিতেন তিনি সেই বেশেই আসিতেন। আমরা একদিকে দেখিয়াছি একই উৎসবে লর্ড কাইফ্ ও লর্ড রোজবেরী আসিয়াছেন, আবার বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতও খালি পায়ে ও একখানি কম্বল গায়ে আসিয়াছেন। ইহা সর্ব্ববিদিত যে মাঘোৎসব ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ে প্রচণ্ড শীত, সুতরাং কোন প্রকার গরম কাপড় বা জামা না পরিয়া আসার কথা কাহারও মনে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে এরূপ কথা উদিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে করি, কারণ তিনি বহুদিন যাবৎ উৎসব সম্বন্ধীয় উপাসনা ও সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিলেন। যদি কেহ তাঁহার নাম করিয়া উপরোক্ত ভাবের কোন কথা লিখিয়া থাকেন, তবে আমরা আবার বলিব, তিনি খুবই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমরা মূল চিঠিখানি না দেখিলে ইহার অধিক কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের প্রতি আদিব্রাহ্মসমাজের কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহার দুই-একটি পরিচয় নিম্নে দিতেছি। স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, এফ, আর, এ, এস প্রণীত "শ্রুতিস্মৃতি" নামক একটী পুস্তক আছে। এই পুস্তকে বহু প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আছে। ঐ পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ" নামক আখ্যায়িকায় যাহা লিখিত আছে, তাহার সারমর্ম্ম এই:—

পরমহংস মহাশয়ের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া সালিখার নিকট গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহারা কঠোর তপস্যায় কালযাপন করিতেছিলেন। গঙ্গার উপর মহর্ষির বজরা দেখিয়া স্বামীজী গুরুভাইগণকে লইয়া মহর্ষিকে দেখিতে গেলেন। মহর্ষির প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাদিগকে মহর্ষির সহিত দেখা করাইয়া দিলে মহর্ষি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজীর মুখ হইতে পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া মহর্ষি আনন্দ ও শ্রদ্ধার সহিত বলিয়া উঠিলেন "তা তিনি কতবড় ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন"। তাহার পর গীতা হইতে "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" শ্লোকটী ও হাফেজের একটী বয়েদ আবৃত্তি করিয়া বিবেকানন্দের সহিত নানাপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিলেন, ঋষিরাও অনেক স্থানে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন সত্য; কিন্তু আমি তার যাথার্থ্য বুঝি না। ইহার পর বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে মহর্ষি সহর্ষে তাঁহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "তোমরা এই রাজ্যে আরও গভীরভাবে প্রবেশ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া স্বদেশে

ফিরিয়া আসেন, তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমাদের (আদিব্রাহ্মসমাজের) পার্থক্য নিতান্ত বাহ্য ও গৌণ—উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। সে উদ্দেশ্য উপনিষদের সত্যসমূহ প্রচার ও সাধন করা। সেই উদ্দেশ্য তিনি সফল করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের নমস্য।"

স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে আসিলে মহর্ষি স্বামীজীর সিমুলিয়ায় বাটীর ঠিকানায় তাঁহার সাফল্যে প্রীত হইয়া একটী আশীর্ব্বাদপূর্ণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। মহর্ষিদেবের সহিত স্বামীজীর আজীবন প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে মহর্ষি তাঁহাকে প্রায়ই আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন। মহর্ষি স্বামীজীকে যেমন স্নেহ করিতেন, স্বামীজীও তাঁহার প্রতি সেইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন "রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের attitude চিরদিনই reverential; তাঁকে আদিব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই আদর্শ যোগী পুরুষ ও সিদ্ধ ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। যাঁহারা মনে করেন ও প্রচার করেন আমরা রামকৃষ্ণদেবকে "a saint belonging to lower level" বলি, আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের ঐ প্রকার উক্তি নিতান্তই অসঙ্গত ও অন্যায়। পরমহংসদেব আমাদের একান্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।"

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা আলোচনা করিয়া আমরা আশা করি রামকৃষ্ণ দেবের অনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ রোমাঁ রোলাঁ মহাশয়ের উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মসম্প্রদায় মাত্রেরই কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইবার কারণ থাকিলেও তাহাতে কোন প্রকার ইন্ধন দেওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ ঐ বিদ্বেষবহ্নির উপর শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া উহা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করা। আমরা শুনিতেছি, রোমাঁ রোলাঁর যে গ্রন্থে এই বিষয়ে উক্তি আছে, সেই গ্রন্থ উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করি, অনুবাদক এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া অথবা উল্লিখিত উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া স্পষ্টরূপে লিখিয়া যেন গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কথা।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।)

সুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মেদিনীপুরের ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি সম্ভবতঃ ইং ১৮৪১ সালে মেদিনীপুর সহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। লিওনার্ড সাহেবের রচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে। শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুর হইতে বদলী হইলে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ অবসন্নদশা প্রাপ্ত হয়। পরে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া যাইলে তিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজকে ইং ১৮৫২ সালে পুনর্জ্জীবিত করেন। রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী-সংগ্রহকার প্রসিদ্ধ ৺ঈশানচন্দ্র বসু ছাত্ররূপে রাজনারায়ণ বাবুর সহিত পরিচিত হন, এবং পরে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়া আইসে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কটকের জমিদারীতে প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে পাল্‌কীর ডাকে যাইতেন। তাঁহাকে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া যাইতে হইত। তখন মেদিনীপুর যাইবার অন্যবিধ সুবিধা ছিল না। মেদিনীপুরে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য দুই-চারি দিন অবস্থান করিতেন এবং মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে উপদেশাদি দিতেন। মহর্ষি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণের মোট ব্যয় দুই হাজার টাকার মধ্যে আট শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু যতদিন মেদিনীপুর ছিলেন ততদিন মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবুর জীবনস্মৃতি হইতে দেখিতে পাই যে, মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রথম অবস্থায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটীতে হইত; পরে স্কুলগৃহে স্থানান্তরিত হয় (৭৬ পৃঃ) ও পরে নবনির্ম্মিত গৃহে চলিতে আরম্ভ হয়।

রাজনারায়ণ বাবুর অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরে হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ইং ১৮৫৩ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৬ অব্দে শেষ হয়। তাঁহার ব্রহ্মসাধন পুস্তক ঐ স্থানেই রচিত হইয়াছিল। তাঁহার Defence of Brahmaism and Brahma Samaj ঐ স্থানেই প্রণীত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তথাকার গোপগিরিতে যাইয়া উপাসনা হইত। রাজনারায়ণ বাবু মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুরের

সান্নিধ্যে অন্য অন্য স্থানেও উপাসনা ও প্রচার করিতে যাইতেন। তিনি তথায় আসিয়া অনেকগুলি জনহিতকর সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইং ১৮৬৬ সালে তিনি ভগ্নদেহে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি মেদিনীপুর যাই, ব্রাহ্মসমাজগৃহ ভগ্ন অবস্থায় পরিণত জানিলাম শুনিয়াই পূর্ব্বতন ময়ূরভঞ্জ মহারাজ ব্রাহ্মসমাজগৃহের জন্য তাঁহার জঙ্গল হইতে কয়েকখানি কড়িকাঠ বিনামূল্যে দান করেন। পরে সাধারণের চাঁদায় গৃহসংস্কার হইয়া যায়। এক্ষণে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সে শক্তি নাই। উপাসনা একভাবে বলিতে গেলে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

কয়েক দিনের জন্য মেদিনীপুর অবস্থান কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৪ শকের ১১ই ভাদ্র তারিখে মেদিনীপুর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লিখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

পরমপ্রিয়দর্শনেষু—

অসংখ্যনমস্কারাঃ আশীর্ব্বাদাঃ সন্ত—

তোমার প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া অবগত হইলাম, এখন অনেকেরই হৃদয় ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেছে। অনেকেরই রসনা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্যে উৎসুক হইয়াছে। ইহাতে আমাদের আর আনন্দের সীমা কি। এখন আমাদের নিত্যই মহোৎসব। "সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে, এতে আনন্দের সীমা কি"। মেদিনীপুরেও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির লক্ষণ সর্ব্বত্র আভাস দিতেছে। এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি প্রণয়বন্ধন দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর বাবু এইক্ষণ কৃষ্ণনগরে আছেন। * * * * তুমি অপরাজিতচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম যে পালন করিতেছ এবং সুস্নিগ্ধ সরল বিনয়বাক্যে ব্রাহ্মদিগের মানস আকর্ষণ করিতেছ, ইহাতেই তোমার সাধুকামনা সকল সিদ্ধ হইবে ও ঈশ্বরপ্রসাদে তোমার জয়লাভ হইবে। * * * শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বাবু তোমাকে নমস্কার দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের মিলনসাধনের উপায়।

১। উপাসনার একই আদর্শরক্ষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (যাহা পরে আদিব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হইল) হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম পৃথক হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার পর অবধি আজ বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের শাখাগুলির মধ্যে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আশা ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে অধুনা বড়ই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখার মধ্যেই মিলিতভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা খুবই জাগিয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রেভারেণ্ড ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় বাগনানস্থিত ব্রহ্মানন্দ আশ্রম হইতে এক পত্র লিখিয়া আমরা এই মিলন সাধনের কি উপায় স্থির করিতেছি জানিতে চাহিয়াছেন। আমরাও যে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিয়াছি তাহা নহে, আমাদের মতে মিলনসাধনের সর্ব্বপ্রথম উপায় শাখাত্রয়ের উপাসনার আদর্শ একই রক্ষা করা। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী এক প্রকার; ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা মূলতঃ কেশবচন্দ্রপ্রবর্ত্তিত উপাসনাপ্রণালী অনুসরণ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রণালী প্রধানতঃ কয়েকটী বৈদিক মন্ত্র অবলম্বনে গঠিত। অপর দুই শাখা সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে সমাধান-মন্ত্র অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং" মন্ত্রাংশটুকু সংযুক্ত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; এবং প্রার্থনামন্ত্রের (অসতো মা সদ্গময় ইত্যাদি) বাঙ্গলাটুকু অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, অপর দুই শাখার অনেক সভ্য বলেন যে, আদিসমাজের সমাধান-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু বিস্তৃত 'আরাধনা' সংলগ্ন না থাকায় আদিসমাজের উপাসনা তাঁহাদের নিকট অল্পাধিক লঘু বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যখন অপর দুই শাখার উপাসনায় উপস্থিত হন, তখন উপরোক্ত "অসৎ হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও" ইত্যাদি মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরটী প্লুতস্বরে উচ্চারিত হইবার কারণে এবং "সৎস্বরূপে"র স্থানে "সত্যেতে" বলায় যতিভঙ্গের কারণে তাঁহাদের কর্ণে উপাসনাটী বড়ই বিসদৃশ ঠেকে।

ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখার মিলনের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে আমার মনে হয়, তিন শাখার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি মিলিত হইয়া উপাসনা-

প্রণালীর একটা সাধারণ আদর্শ সর্ব্বপ্রথম স্থির করা উচিত। আমাদের মনে রাখা উচিত, ব্রাহ্মসমাজের আদি লক্ষ্য হইল ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা যদি সত্য হয় এবং সে বিষয়ে আমরা যদি একমত হই, তবে বোধ হয় ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, সংস্কৃত ভাষাকে আমাদের উপাসনাপ্রণালীর মূল প্রতিষ্ঠাভূমি করিয়া উপাসনাপ্রণালীকে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতেও আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত একাধিকবার সাক্ষাতে যখনই এবিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, তখনই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা যে কি ভুল করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।" আমরা যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, উপাসনা প্রণালীর সংস্কার সাধন করিতে গেলে আদিসমাজকেও কিছু ছাড়িতে হইবে ও গ্রহণ করিতে হইবে, এবং অপর দুই শাখাকেও কিছু ছাড়িতে হইবে আর কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে উপাসনাপ্রণালীর সংস্কারই হইবে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মিলনসাধনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সোপান। এই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। মিলনসাধনের প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের প্রকৃত অনুরাগ দেখিলে আমরা আরও কতকগুলি ইঙ্গিত ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি, আর, এস)

(২)

২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর এই কয়দিন এক আশ্চর্য্যভাবে কাটিয়াছে। ঘড়ি আমাদের কাছে একটাও ছিল না—কাজে কাজেই সময়ের জ্ঞানটুকু ছিল না। কখন যে কি করা হইয়াছে, তাহারও ঠিক নাই—বেশ একরকম! তারপর, কোন্ দিন, কি বার, তাহার ত ঠিকানা প্রায় ছিল না; বাহির হইতে কোনও-প্রকার খবর আসিবারও কোনও উপায় ছিল না। সাত-আট ক্রোশের মধ্যে একটীও ডাকঘর নাই, ভদ্রলোকের বাসও নাই। আছে কেবল প্রকৃতির অনন্ত উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য, নগ্ন স্বভাবের অকৃত্রিম বিকাশ, দরিদ্র চাষীর পল্লীকুটীরে সোনার ধানের রাশি, সীমাহীন প্রান্তর, নির্ম্মল আকাশ ও অসংখ্য কুমীর। যেন এ কয়দিনের জন্য সভ্যতার আলোকবিহীন আদিম মানবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিলাম। প্রকৃতির মধ্যে আপনাদের ওতঃপ্রোতভাবে মিশাইয়া দিয়া পরমানন্দরসের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন, আকর্ষণ এবং সভ্যতার শতকার্য্যে মুক্ত এ রকম জীবন উপভোগ অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। আমার আগে ধারণা ছিল যে সুন্দরবন না জানি কি ভয়ানক বন। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখি বন ত দূরের কথা, গাছের চিহ্নমাত্র নাই। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে সব জমি হাসিল হইয়াছে। আগে যেখানে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু স্বচ্ছন্দে নিরাপদে বিচরণ করিত, এখন সেখানে মানুষ নির্ভয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অবশ্য অন্যান্য অনেক জায়গায় ভীষণ অরণ্যানী বর্ত্তমান, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বহুদূরে।

এ কয়দিন কি রকম কাটিয়াছে, তাহার একটু আভাস দিই। আমার দুইজন প্রায় সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল। আমরা তিনজনেই ভোরবেলা উঠিতাম; তখন মাঠের উপর ঘন কুহেলিকা স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত; গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির-বিন্দু মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। গরম জামা গায় দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কুয়াশা ভেদ করিয়া মাঠে, অপথে, কুপথে বনে জঙ্গলে খুব করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম, যতক্ষণ না সূর্য্যের তাপ প্রখর হইত। বাড়ী আসিয়া ভুরি ভোজন করিয়া আবার বাহির হইতাম। কোনও দিন কুঁচফল তুলিতে যাইতাম; কোনও দিন বা খালের মাঝখানে দ্বীপের উপর বাঁশী বাজাইয়া, গান গাহিয়া, গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম; কোনওদিন বা দ্বিতীয় কলাম্বাস বা পেরীর মত কোনও অনাবিষ্কৃত স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য সোৎসাহে অভিযান করিতাম, কোনও দিন বা নিজেরা নৌকা চালাইবার প্রয়াস পাইতাম। আমি থাকিতাম হালে আর ওরা দাঁড় টানিত। তারপর আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সবাই মিলিয়া পুকুরে ঝাঁপ দিতাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক আনন্দের আতিশয্যে ঝাঁপাঝাঁপি মারামারি ও ডুবাডুবি করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া উপরে উঠিতাম। সে কি মজা! ভাত খাওয়ার পর হইত এদিক-ওদিক বেড়ান, গল্প, লেপমুড়ি দিয়া ঘুমান অথবা কুমীর শীকার। ওদের বন্দুক ছিল, ওরা ছুড়িত। বিকাল হইলেই আবার একবার খাইয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম; বাঁশী লইয়া সারাপথ বাজাইতে বাজাইতে। বাঁশী আমার নিত্যসঙ্গী ছিল, তাহার সঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও হই নাই। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে

আহারে বিহারে সর্ব্বদা আমার বুকের কাছে ঘুমাইয়া থাকিত, ইচ্ছামত তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতাম। এই বিজনে সেই ছিল আমার সুখ, আমার আনন্দ, আমার অন্তরের অন্তরতম। বাঁশীর পঞ্চম তানে প্রকৃতির সুরের সঙ্গে, মর্ম্মের নিভৃত গোপন সুর মিলাইয়া দিয়া, বিশ্বপ্রকৃতি আন্দোলিত করিয়া তুলিতাম। সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া না আসা পর্য্যন্ত আমরা শ্যামল তৃণপ্রান্তরে গান গাহিয়া লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিয়া অথবা নৌকাবিহারে সময় কাটাইয়া দিতাম। সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়া পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতেন, সেই অনন্ত নীলিমা যখন অজস্র রংএর লীলায় লীলায়িত হইত, আসন্ন নিশার সেই নীরব চিত্রখানিতে তন্ময় হইয়া দেখিতাম, আলো ও ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ, বর্ণের বিচিত্র বিকাশ। আবার যখন অনন্ত অসীম প্রান্তরের শেষরেখা হইত উষারাণী তাঁহার প্রভাতআলোর ঘোমটাখানি ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া আপনার ব্রীড়ারক্তিম সৌন্দর্য্য লালিমা প্রকাশ করিতেন, তখনও মুগ্ধ হইতাম, প্রকৃতির সেই অপরূপ ভঙ্গীতে। সেই অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আবেশে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। সহরের বিষম বন্ধন ও কোলাহল হইতে এই উন্মুক্ত বিজন বিরলে আসিয়া যেন প্রাণটা পিঞ্জরমুক্ত বনের পাখীর মত আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা অনেক দূর বেড়াইয়া আসিয়া মুড়ি, খেজুরের রস প্রভৃতি অপর্য্যাপ্তপরিমাণে উদরসাৎ করা যাইত, তারপর সঙ্গীদের সঙ্গে শুইয়া গল্প হইত, তর্ক হইত, মানবের আদর্শ, উদ্দেশ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া সমালোচনা হইত। রাত্রে সেই মাটীর কাঁচাঘরে ঘুমাইতে বড়ই আরাম লাগিত।

যাহা হউক, এ কয়দিন কাটিয়াছিল বেশ। শেষে দিনকয়েকের জন্য মামা আসিয়া রহিলেন, তাঁহার সঙ্গে বেশ আমোদে সময় কাটিত। আমি ও আমার দুই পিসতুত ভাই (যাহাদের জমীদারীতে গিয়াছিলাম) আমরা তিনজন ঠিক একপ্রাণ ছিলাম—একসঙ্গে উঠিতাম, বেড়াইতে যাইতাম, গল্প করিতাম, খাইতাম। তাহারা দুইজনেই আমাকে খুব পছন্দ করিত। দুইজনের মন খুব সরল ও কোমল ছিল। কাহারও মনে কোনও গর্ব্ব বা অহঙ্কার ছিল না। তবে তাহাদের মধ্যে যে ছোট, সে ছিল একটু practical, আর বড়টী উদার ও উদাসস্বভাবের। তাহার মন সর্ব্বদাই কোন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিত, তাহার করুণদৃষ্টি যেন কোন্ অপাওয়ার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। সে কবি ছিল না বটে, তবুও প্রাণটা তাহার কল্পনার আঁকা। প্রায়ই দেখিতাম তাহাকে নীরবে নিস্তব্ধে আপন মনে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে। তাহাদের সংসর্গে আমার দিনগুলি খুব আমোদে কাটিয়াছিল, সে স্মৃতি মুছিবার নহে।

একদিকে যেমন সরলহৃদয় চাষীদের দেখিয়া ও তাহাদের রাশি রাশি সোনার ধানভরা মরাই দেখিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলাম, অন্যদিকে তেমনি দীন-দুঃখী প্রজাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্তে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম। জমিদার ও প্রজা পরস্পরের সম্বন্ধ এইবার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। আর একটা ব্যাপার আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল। এদেশে কোনও ভদ্রলোকের বাস নাই। সেজন্য এখানকার সবাই, পরিষ্কার কাপড়-জামা পরিহিত ভদ্রবেশধারী আমাদের কয়েকজনকে বাহির হইতে দেখিলেই কোন্ অজানা রাজ্যের লোক ভাবিয়া অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত একদৃষ্টিতে। এমনই আশ্চর্য্যজনক জীব আমরা!

দিনকতক এইভাবে বেশ লাগিয়াছিল, কিন্তু একেবারে সহরে কিনা—যতই নতুনত্বের মোহ কাটিয়া যাইতে লাগিল, ততই বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। চিঠিপত্র ত পাইবার উপায় নাই, কাজেই বাড়ীতে যাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহারা সকলে কেমন আছে, সঙ্গীরা কি করিতেছে, কোথায় আছে, এই চিন্তা মাঝে মাঝে মনকে আলোড়িত করিত। তাহাদের প্রত্যেকের কথা একাকী শুইয়া ভাবিতাম; একএকটী চিত্র চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত, আবার ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইত। খবরের কাগজের নামগন্ধ নাই। প্রাণ আরও ব্যাকুল হইত রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য। কলিকাতায় কি হইতেছে, যুবরাজের কি হইল, আইন অমান্যের কি ফল হইল, কংগ্রেস কিরূপ অনুষ্ঠিত হইল, কোন্ পথ নির্দ্দিষ্ট হইল, এই সব খবর জানিবার জন্য উৎকণ্ঠায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্য এই যে এত শান্তি ও নির্জ্জনতার মধ্যে আসিয়াও চঞ্চল স্বভাব, আত্মাকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে দিল না। আমার ভায়াদেরও মন বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গুরুজনদের সে ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া ফন্দী আঁটিলাম যে, আমরা তিনজনে মিলিয়া আগেই চলিয়া যাইব। নৌকার দরকার নাই, হাঁটিয়া কুল্পী পর্য্যন্ত যাইয়া সেখান হইতে ডায়মণ্ডহারবার পাল্কী করিয়া যাইব। এই মতলব করিয়া আমরা ৩১শে ডিসেম্বর ভোরবেলা বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আগে থেকেই গুরুজনদিগকে এই চক্রান্তের কথা বলা ছিল,

কাজেই দুই ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই দরোয়ান ছবিরাম আসিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। যাহা হউক আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইল। উপরওয়ালারা তারপর দিন যে করিয়াই হউক আমাদের পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

নানাকথা।

প্রাণদণ্ড হইতে মুক্তি।—আমরা গতবারে নেপাল রাজ্যে প্রাণদণ্ড রহিত বিধান উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে রহিত করার একটী প্রধান যুক্তি এই যে বিচারে ভুলভ্রান্তি হইয়া নির্দ্দোষী ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হওয়া অসম্ভব নহে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে (বঙ্গবাসী ১৩ ভাদ্র ১৩৩৮) দেখিলাম যে কালু বেহারা নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে খুলনার সেসন জজের নিকট আনীত হয় ও সাতজন জুরী সাহায্যে তাহার বিচার হয়, জুরীগণের মধ্যে ৩ জন তাহাকে দোষী বলেন, একজন সন্দেহের সুযোগ দেন এবং তিনজন নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু সেসন জজ তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পরিবর্ত্তে একেবারেই হত্যাপরাধী স্থির করিয়া হত্যাপরাধী অর্থাৎ প্রাণদণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া হাইকোর্টের অনুমোদন প্রার্থনা করেন। হাইকোর্টের বিচারকদ্বয় তাহাকে হত্যাপরাধী স্থির করা তো দূরে থাক, তাহাকে একেবারেই বেকসুর খালাস দিলেন। তাহার যদি সেসনস জজের আদেশ অনুসারে এবং জুরীর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইলেও সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে যদি তাহার প্রাণদণ্ড হইত তবে সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দায়ীত্ব কিরূপ গুরুতর হইত বলা যায় না। এইরূপ বিচার-বিভ্রাটের কারণেই আমরা প্রাণদণ্ড রহিতের পক্ষপাতী। ইংরাজীতে আইন সম্বন্ধীয় এই প্রবাদটী বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অপেক্ষা দশজন দোষী ব্যক্তির মুক্তিলাভ হওয়া শ্রেয়ঃকল্প।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে "বঙ্গবাসী" বর্ত্তমান তরুণ সমাজের এক সম্প্রদায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার সবল লেখনী পরিচালনা করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর ন্যায় শক্তিশালী সংবাদপত্র যখন ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তখন আমরা আশা করি বঙ্গীয় সমাজে দুর্নীতির প্রসার অচীরে প্রতিরুদ্ধ হইবে, কিন্তু এক আধবার প্রবন্ধ লিখিয়া ফলাফল অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না—সপ্তাহের পর সপ্তাহে বঙ্গবাসীর লেখনী যতদিন না অসাড় হইয়া পড়ে, ততদিন দুর্নীতির মস্তকে মুষ্টির পর মুষ্টি সজোরে আঘাত করিতে হইবে। এই বিষয়ে বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হন, এবং দেশের জনসাধারণকে আকর্ষণ করেন তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে নিশ্চয়ই সফল করিবেন।

দীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ।—আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া কথকতা, পুরাণ পাঠ ও রামায়ণ গীত প্রভৃতি হইয়া থাকে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাহার যখন ইচ্ছা সে তখন আসিয়া মনের তৃপ্তি সাধন পর্য্যন্ত উহা শ্রবণ করে এবং যখন তাহার ইচ্ছা হয় তখন সে চলিয়া যায়। বর্ত্তমানে ঐরূপ দীর্ঘকালব্যাপী কথকতা প্রভৃতি এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে :বলিলেও চলে। স্বল্পকালস্থায়ী বক্তৃতাদি ঐ সকলের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে, বক্তৃতাগুলি যতই মিষ্ট হউক আন্দাজ দুই ঘণ্টার বেশী দীর্ঘ হইলে শ্রোতৃবর্গ অধীর হইয়া উঠে এবং নানা উপায়ে তাহাদের বিরক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়। সুমিষ্ট গীতাদি সম্বলিত হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশগুলি আন্দাজ অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক কালব্যাপী হইলে সাধারণতঃ শ্রোতৃবর্গের বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে, এই কারণে এ বিষয়ে এদেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণ বোধ হয় একটু সতর্ক থাকেন। পাশ্চাত্য প্রচারকগণ সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের উপদেশাদি সমস্ত কার্য্যই যাহাতে সান্ধ্য ভোজন সময়ের পূর্ব্বেই শেষ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে সযত্ন থাকেন, কিন্তু সম্প্রতি আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে আমেরিকার অন্তর্গত Los. Angelos নগরে এক ধর্ম্মপ্রচারক কুড়ি ঘণ্টাব্যাপী উপদেশ দিয়াছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন এই নগরটীর অধিকাংশ অধিবাসী নিগ্রো, উপদেষ্টা তাঁহার উপদেশের মধ্যে মধ্যে বিবিধ ফলের রস খাইয়া উদরের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ ফলের রস পান করিবার ফলে এই দীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ প্রদানেও তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই, বরং তিনি বেশ সুস্থবোধই করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে নিগ্রোদিগের ব্যাপ্টিষ্ট গির্জ্জার এক ধর্ম্মোপদেষ্টা চৌদ্দ ঘণ্টা ধরিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষুধার তাড়না নিবৃত্তি করিবার জন্য নানাবিধ মাংসাদি আহার্য্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত উপদেষ্টাগণের কোন কষ্ট

হয় নাই ধরিয়া লইলেও শ্রোতৃবর্গের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র মনশ্চক্ষে কল্পনা করা যাইতে পারে।

৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু—গত ৫ই ভাদ্র ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। ইহাঁর নাম বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে চিরমুদ্রিত থাকিবে। ইহাঁর শ্রেষ্ঠতম অক্ষয় কীর্ত্তি "বঙ্গবাসী" সংবাদ-পত্র। বঙ্গভাষায় অতি সস্তায় মাত্র বার্ষিক দুই টাকা মূল্যে একখানি সুবৃহৎ সংবাদপত্র স্থায়ীভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, যোগেন্দ্র বাবুই তাহার পথপ্রদর্শন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ আদর্শের সহিত বঙ্গবাসীর আদর্শ পৃথক হইলেও হিন্দু দেশবাসী যাহাতে ঋষিমুনিদিগের প্রচারিত সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে আস্থাবান হয় এবং দেশবাসীদিগের মতিগতি পাশ্চাত্য রীতিনীতির দিকে চলিয়া না পড়িয়া শাস্ত্রোক্ত রীতিনীতির দিকে ফিরিয়া আসে, এ বিষয়ে "বঙ্গবাসী" পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির সাহায্যে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে বিষয়ে যে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের মতবাদসমূহকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত বঙ্গবাসীর তৎকালীন প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু দেশীয়ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা আনিবার বিষয়ে তাহার মতের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের মতের যে ঐক্য ছিল না, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় তাঁহার অপ্রিয় সত্য কথার ভিতর দিয়া আমরাও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, আবার ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক কোন কোন সত্য বঙ্গবাসীর কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন দেখি। এখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণগ্রহণ করাকেই আমাদের জীবনের ব্রত করিলে দেশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইবে। কেবল সুলভ সংবাদপত্র প্রকাশ নহে, যোগেন্দ্রবাবু সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশ করিয়া প্রত্যেক হিন্দু পরিবারকে শাস্ত্র-নিহিত অমূল্য রত্নসকল দেখিবার যে সুযোগ দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষর ও তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। অনেকের জানা নাই, বঙ্গবাসীর ন্যায় সুলভে না হউক কাল ও অবস্থা উপযোগী সুলভ মূল্যে আদিব্রাহ্মসমাজ বেদান্ত ভগবদ্গীতা পঞ্চদশী প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থসকল সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া এবিষয়ে আদিমতম পথপ্রদর্শকের সম্মানলাভের অধিকার পাইয়াছে।

লর্ড আরউইনের ঈশ্বরবিশ্বাস।—ইউরোপের শিক্ষা ও বিজ্ঞান আমাদের নূতন মনোবৃত্তি দিয়াছে; ধর্ম্ম ও ভগবান বস্তুকে প্রয়োজনের বাহিরে রাখার কথা বাজারে অধিক মূল্যেই বিকায়—ইহা যে বিকৃত রুচির পরিচয়, তাহা আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি।

ভারতের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা আরউইনের কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস ছিল। তিনি অভারতীয় শিক্ষায় মানুষ হইয়াও ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন নাই। ব্রিটিশ ভরতের সর্ব্বোচ্চ আসনে বসিবার অধিকার পাওয়ার শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা সংযুক্ত থাকায়, তিনি আকেজো হইয়া পড়েন নাই; ভারতশাসনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল, ইহা অস্বীকার করার নয়।

ইউরোপের আদর্শ ও বাহ্য চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ একদল ভূয়ো মানুষ দেশের তরুণ মনে বিষ ছড়াইতেছেন——ধর্ম্মে ও ভগবানে অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া। আমরা লর্ড আরউইনের এই ঘটনাটী এইজন্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। ভারতের হিন্দুজাতি অন্তর্য্যামীর দুয়ারে ধন্না দিয়া জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইত, তাহা হইত অব্যর্থ, অমোঘ—ব্যর্থতার আঘাতে হিন্দু নিরাশ হইত না; এই কথা শুনিয়াই সংশয়ী টিপ্পনী করিয়া বলিবেন—তবে আবার এ দুর্দ্দশা কেন! ইহার উত্তর এ ক্ষেত্রে দিব না।

লর্ড হ্যালিফক্স লিখিয়াছেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড আরউইন আসিয়া আমার পরামর্শ চাহেন—ভারতের লাট-পদ তিনি গ্রহণ করিবেন কি না! ইহার উত্তরে আমি বলি, এ বিষয়ের ফলাফল আমাদের হাতের বাহিরে, একমাত্র ভগবান ইহার উত্তর দিবেন, এবং তাহার জন্য আমাদের অনেক প্রার্থনা করিতে হইবে; তাহার পর আমরা দু'জনে ধর্ম্মমন্দিরে যুক্ত করে প্রার্থনা করি; মন্দির হইতে বাহির হইয়া বলি "বোধহয় তোমায় ভারতে যাইতে হইবে।"—লর্ড আরউইন তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন—"আমিও এই অনুভূতি পাইয়াছি।"

মানুষের জটিল সমস্যার মীমাংসা বুদ্ধির সাহায্যে কোনদিন সম্ভব হয় নাই; ভগবানের করুণা যে আলো সৃষ্টি করে, তাহাতেই মনের আঁধার দূর হয় এবং অতি দুর্গম অবস্থায় আমরা সমাধান খুঁজিয়া পাই। ইউরোপের আদর্শেও ধর্ম্ম ও ভগবানের পরম স্থান আছে; ভারতের হিন্দুজাতি অনাবশ্যক বোধে এই শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে যেন বঞ্চিত না হয়। —প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ ১৩৩৮।

বাঙ্গালী গণিতজ্ঞের অদ্ভুত ক্ষমতা।—বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামের শ্রীযুক্ত সোমেশ বসু মহাশয়ের গণিতশাস্ত্রের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা শুনিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমরাও ইঁহার শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যা

বেলা স্বনামধন্য ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ভবনে ইহার অভ্যর্থনার জন্য একটী সভা আহুত হইয়াছিল। উক্ত সভায় কলিকাতার অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় অনেকে অনেক গুলি বড় বড় সংখ্যা দিয়া সোমেশ বাবুকে গুণযোগ প্রভৃতি গণিতবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নকর্ত্তাগণ একটি কাষ্ঠফলকে প্রশ্নগুলি লিখিয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সোমেশবাবু উত্তরগুলি ঠিক ঠিক বলিয়া গিয়াছিলেন, বোধ হয় এক সেকেণ্ডও বিলম্ব হয় নাই। সভার শেষে তিনি কিরূপে এইরূপ ঠিক উত্তর দেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি ইহার ঠিক উত্তর দিতে পারেন না—প্রশ্নের সংখ্যাগুলি লেখা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার মনে উত্তরের একটা ছাপ আসিয়া পড়ে। মনস্তত্ত্বের যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা প্রকৃতই বিশেষ আলোচনার বিষয়। আমরা বাল্যকালে দুই একজন শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর কলিকাতায় আসিতেন দেখিতাম। বিশ জন ত্রিশ জন লোক পরে পরে কত কি বিভিন্ন ভাষায় কত কি বলিয়া গেলেন, ঘণ্টাবাদন প্রভৃতি কত কি কার্য্য করিয়া গেলেন, আশ্চর্য্য এই যে তাঁহারা ঠিক পরে পরে বলিয়া দিতে পারিতেন যে কাহার পর কোন্ কথা বলা হইয়াছে বা কাহার পর কোন্ কার্য্য করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের একটি কথা এই যে, একই মুহূর্ত্তে মন একাধিক বিষয় মনন করিতে পারে না। এই কথার উপর দার্শনিক অনেক বড় বড় তত্ত্ব দাঁড়াইয়া আছে। সোমেশ বাবু অথবা ঐ সকল স্মৃতিধর বা শ্রুতিধরদিগের কার্য্য আলোচনা করিলে আমাদিগের মনে হয় যে, বুঝি মন একই মুহূর্ত্তে একাধিক বিষয় গ্রহণ ও মনন করিতে সক্ষম। যদি উহা ভ্রান্ত হয়, তবে ঐ একাধিক বিষয় গ্রহণ করিবার মধ্যে সময়ের বিচ্ছেদ কত সূক্ষ্ম! উহা মনন করিতে গিয়া মন প্রতিনিবৃত্ত হয়;

"আট বছর বয়সে ইনি চোদ্দ অঙ্কের রাশি দিয়ে মুখে মুখে গুণ করতে পারতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অতি কঠিন কঠিন ভাগ ও অন্যান্য কঠিন অঙ্ক খুব সহজেই করতে পারতেন। কুড়ি বছর বয়সে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তাঁর সহপাঠীরা ঠাট্টা করে বলেছিল যে, আর এক বৎসরের মধ্যে তাঁর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে তিনি বলেন যে, বিবাহ জিনিষটা দৈহিক মিলন নয়, ইহা আত্মার মিলন। কাজেও দেখিয়াছিলেন তাই। ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের পর তাঁর শক্তি এমন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি ১০০ অঙ্কের রাশিকে ১০০ অঙ্কের রাশি দিয়া মুখে মুখে গুণ করে দিতে পারতেন এবং বড় বড় ভাগ, ভগ্নাংশ, দশমিক, পৌনঃপুনিক, সমীকরণ ইত্যাদি অঙ্ক (division, fraction, decimals, recurring, equations) আশ্চর্য্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুল ভাবে মুখে মুখে কষে দিতে পারতেন। এখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স, কিন্তু সে শক্তি আদৌ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। আহার মাত্র এক বোতল দুধ, কিন্তু অদ্ভুত দেহের শক্তি। প্রত্যহ ১৫ মাইল পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে হাঁটতে পারেন। উপবাস দিতেও খুব পটু। একবার সাড়ে চব্বিশ দিন নির্জ্জলা উপবাস করিয়াছিলেন। যদিও ওজনে সাত পাউণ্ড কমেছিলেন, তিন দিনের মধ্যেই আবার তাহা পূরণ করে নিয়েছিলেন। আট দিন উপবাসের পরও হেঁটে গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। সপ্তাহে একটি দিন তিনি কোন কাজ করেন না বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।

১৯২৩ সালে যখন আমেরিকায় যান, তখন একদিন কয়েকটি অধ্যাপক ও ছাত্রদের সামনে তাঁর পরীক্ষা হচ্ছিল। তিনি মনে মনে ৬০ অঙ্কের রাশিকে ৬০ অঙ্কের রাশি দিয়ে গুণ করে দিলেন। অধ্যাপকেরা কালি-কলম নিয়ে অনেকক্ষণ কষে বল্লেন, গুণফল সামান্য ভুল হয়েছে। ইনি মনে মনে আর একবার কষে নিয়ে বল্লেন কখনই ভুল হয়নি। পরে অধ্যাপকরা আবার কষে দেখলেন তাঁদেরই ভুল হয়েছিল। ১৯৩০ সালের ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যা বেলায় Masonic Pythusen Temple তাঁর এই অদ্ভুত বিদ্যার প্রদর্শন হচ্ছিল। একজন ভদ্রলোক খুব গম্ভীরভাবে হাতের একটা বড় কাগজ থেকে কয়েকটা প্রশ্ন ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে দিলেন; যথা—

৩১৯৯৩৯১২০৬৫৯৯১৯১২৩ ইহার ঘন মূল (cube root) কত? তৎক্ষণাৎ উত্তর হল ৬৮৩৯৪৭।

৭৭৩৫২৯৪৭১১২৪৫৭৬০২৭৫১৩২০১৮৯৭৩৪২০৫৫৮৬-৬১৭১২৩৯২ ইহার সপ্তদশ মূল (seventeenth root) কত? উত্তর ২১২।

প্রত্যেকটা উত্তর দিতে তাঁর এক সেকেণ্ড করে সময় লেগেছিল। আর এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—

৯৫২৮১২৮ ইহাকে পাঁচ শক্তিতে উন্নত করুন (rise to the 5th degree)।

উত্তর—৭৮৫৩০৪১৮৮৭১৪৯০৬৫৭৩৯১৭৪২৯১১৬-৩৫৭৮৩৬৮। এই উত্তরটী দিতে ঘড়ি ধরে ৩ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড লেগেছিল। এই সবই কাগজ কলমের সাহায্য না নিয়ে মনে মনে কষে ছিলেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বসু মহাশয়কে যে সব অঙ্ক দেওয়া যায়, তা এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁর অবিকল মনে থাকে। প্রত্যেক অঙ্কের প্রত্যেক ধাপটি

তাঁর মনে থাকে এবং ধাপের দক্ষিণ দিকে বা বাম দিক হতে যে কোন সংখ্যা বলে দিতে পারেন। এমনি অদ্ভুত তাঁর স্মৃতিশক্তি।

এ বৎসর ১৮ই এপ্রিল তিনি বিলাত যাত্রার চার দিন আগে তাঁর ঐ শিল্পী বন্ধুর অনুরোধে মনে মনে ১০০ সংখ্যার রাশিকে ১০০ সংখ্যার রাশি দিয়া গুণ করে দেখিয়েছিলেন। তার নমুনা দেখলেই আমরা বোধ হয় মূর্চ্ছা যাব।" বঙ্গবাসী শ্রাবণ, ১৩৩৮।

ভাদরে (গান)।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাহার—একতালা।

ভাদরে বাদল নেমেছে ;
দিবানিশি ধরে
বারি ঝরে শত ধারে—
টুপি টাপি ধ্বনিতেছে।

পাখী ভিজে গাছে গাছে
চুপে চাপে বসে আছে—
কাতরে চাহিছে।
বিদ্যুৎ খেলে কালো মেঘে বলাকারাজি ;
নাচে ময়ূর ডাকে ভেক—
বাদল-মাদল বাজিছে॥

THE BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(2)

13. Keshub Ch. and Rev. J. Long.

It was at this club that Keshub Chunder first distinguished himself in the delivery of *extempore* speeches. On one occasion it is reported that it was proposed at a meeting of this fraternity that the business of the club should be commenced with a prayer to God for its success. This proposal was objected to by the Rev. J, Long on the ground that no prayer could be addressed to the lifeless god of the Hindus. In answer to this Keshub Chuder said that the God to whom he prayed was not a lifeless one, and so eloquently demonstrated the living presence of the living God to his audience, that they unaminously supported the proposal of offering the prayer.

14. Circulation of motto bearing slips.

One of the methods adopted by this club for the conversion of their countrymen was the circulation of slips of paper bearing among others the following mottos: "Attend ye passers by to your future concerns. There is no peace in this transitory world, Think of death and be wise." Such a course, however, failed to afford the result anticipated. The people looked upon it as the handy work of Christian missionaries, and passed it by.

15. Attachment of friends to Keshub.

It is said that though some acts of Keshub Chunder were not in accordance with those of the other members of his little club, and though many differed from him in some of their opinions and sentiments concerning religion, yet the young fraternity was so closely attached to him by reason of his amiability and virtue, that they agreed to whatever he said and proposed.

16. He founds a dramatic club.

It may perhaps be interesting to mention here the establishment of a dramatic club in 1856 by Keshub Chunder and some of his friends. During the existence of this club, Keshub Chunder personated with success the rôle of Hamlet. In 1857 he acted parts in the Bengali drama of "Kulina Kula Sarvaswa" at Chinsurah, and subsequently in some other Bengali plays written on the model of Ratnavali, which were produced with great splendour at the Rajbari of Paikpara. His last performance was after he had left college in 1859, when he appeared in a play entitled "Widow Marriage," written by Umesh Chandra Mitra of Bhowanipore.

17. He meets with Rajnarain Bose's Discourses.

Although during these four or five years Keshub Chunder had devoted a portion of his time and attention to theatrical pursuits, he had not neglected more important matters. He was in the meantime earnestly endeavouring to discover the best form of faith for his future guidance. While thus engaged he happened to meet with a volume of Rajnarain Bose's *Brahma Samaj* Discourses, the sentiments expressed which, especially the discourse on the "Principal Traits of Brahmaism," he found to be quite conformable to his own views on the subject.

18. His acquaintance with Devendra Nath and joining the samaj—1858 A. D.

Prior to this, he had had no acquaintance with any member of the *Brahma Samaj* ; but when he found that its doctrines and tenets were perfectly in unison with the dictates of his own conscience, he could not refrain from expressing his convictions to some of the leading members of the *Samaj*, and intimating his desire of joining that institution. This step made him personally acquainted with Devendranath Thakur, who in turn visited Keshub Chunder's little club, and afforded it the best encouragement he could. Thus, at the age of 20, in 1858, Keshub Chunder joined the *Samaj*, and his little fraternity shortly after followed their leader's example. The immediate cause of his acquaintance with Devendranath [illegible] was his anxiety to take his advice about the propriety of taking *mantra* from his family *guru*, who was pressing him at the time to accept it from him. Devendranath, in order to try his firmness, represented to him the social risk of refusing to take *mantra*, but, seeing him resolute, advised him to dispose with that ceremony, considered so essentially necessary by a Hindoo for his future salvation.

19. Keshub Ch. joining office.

When the elder members of Keshub Chunder's family found him, at so early a period of his life, inclined to a religious career, to the detriment of his worldly concerns, they determined if possible to dissuade him from this course. In consequence of their entreaties and persuasions he joined an office as a writer. As he often complained of the duties of a writer being irksome and incongenial to his mind, they naturally did not in any way change or weaken the fixed purpose of his mind, for he devoted a portion of his leisure time, snatched from the toils of business to write tracts on religious subjects.

20. He resigns appointment.

Imbued with the idea that he was created to work in a far different field than the one he was engaged in, and finally believing that he was made to serve his Heavenly Master, and to sow the pure seed of truth and salvation in the benighted minds of his countrymen, he soon resigned his appointment, and determined to dedicate his life to the service of the Church.

21. His strong stand in the face of threatened persecution.

The days when Keshub Chunder embraced Brahmaism were far otherwise than favourable to its proselytes. It was then considered a serious breach of orthodoxy even to enter the *Samaj*. No sooner had Keshub Chunder formed an acquaintance with Devendranath Thakur—an acquaintance which led to his conversion to Brahmaism—than his relations at home began to threaten and persecute him as much as lay in their power. The elders of his family were shocked and disgusted at his unconventional conduct, and refused to tolerate the liberties he took, in defiance of the orthodox religion of his country in which he had been born and brought up. But the greater the opposition and impediments thrown in his way, the stronger grew Keshub Chunder's courage and independence. At this critical period of his life he was fortunate in possessing the entire sympathy and honest affection of Devendranath Thakur, which, coupled with his own intrepid nature, aided him in withstanding the persecutions and annoyances which assailed him.

22. He joins the Bank of Bengal—1859. A.D.

In 1859 Devendranath Thakur proceeded on a voyage to Ceylon, for the sake of his health, accompanied by Keshub Chunder. On the return of the party to Calcutta, Keshub Chunder again entered service, and joined the Bank of Bengal as a writer, on Rs. 25 a month, which was shortly after raised to Rs. 50, owing to the neatness of his handwriting. While employed in the service of the Bank, he put forth a pamphlet entitled "The Young Bengal."

23. He founds the Sangata Sabha—1783 *Saka* (1860 A. D.)

The year 1860 (1783 Saka) is chiefly remarkable for the share Keshub Chunder took in establishing the Sangata Sabha, an institution whose main object was the abolition of the caste system, and the practice of idolatrous rites by Brahmas; as well as the introduction of the practice of widow marriage, and inter-marriage of different castes.

24. His mission to Madras and Bombay—1784 *Saka* (1861 A. D.)

In 1861 the *Samaj* sent out many missionaries to distant parts of India. Keshub Chunder undertook the mission to Madras and Bombay.

25. Keshub Ch. ordained minister of the samaj—1784 *Saka* (1862 A. D.)

On his return in 1862 (1784 Saka) he was ordained as Acharya or minister of the *Samaj*.

26. Keshub brings wife to Devendra Nath's place.

It was about this time on the occasion of a festival he wanted to bring his wife to Devendranath Thakur's house, but was opposed by his entire family, on the ground of Devendranath's heterodoxy. As both sides were equally determined, a serious quarrel was imminent, but the intrepidity of Keshub Chunder prevailed, and his wife and himself were allowed to depart unmolested. This behaviour cost him dear. "For six months," says Miss Collett, * "the heretical couple were exiled from the family house, when at last at the end of that time Keshub Chunder become dangerously ill, his kinsfolk relented, acknowledged his legal rights, and allowed him to return to his place in the family.

27. *Namakarana* ceremony of Keshub Chandra's sons with Brahmic rituals in his house.

This triumph of Keshub Chunder's was quickly followed by a more important one, the introduction of Brahmas and Brahmic ceremonies into his family. This took place on the occasion of the *nama-karan*, or name giving ceremony of Keshub Chunder's first-born son, when an assemblage of Brahmas was called at the family residence to celebrate the ceremony according to Brahmic ritual. This is another instance of the adoption of Brahmic rites in lieu of Brahmanic ones after their introduction by Devendranath Thakur.

28. Keshub secretary of the samaj and Pratap Ch. Mazumder editor of the T. Patrika—1786 *Saka* (1862 A. D.)

In 1862 (1785 Saka), Keshub Chunder was appointed official Secretary of the *Samaj*, and his friend, Pratap Chandra Mazumder, assumed the editorship of the *Tattwabodhini Patrika*.

29. Differences between Devendranath and Keshub Ch. led to the establishment of the *B. S.* of India,

Up to this time Keshub Chunder and Devendranath Thakur had worked in unison for the good of the *Samaj*. But from this time differences arose between them, which led to disunion, and the subsequent establishment of the *Samaj* of India

* Miss Collett has mistaken this ceremony for the Sacrament of Jata-karma, or birth festival, when she says: "He still preserved his independence of action, which he showed soon afterwards, at the birth of his eldest child, when he insisted in performing the Jata-Karma, a birth festival in simple Brahmic form."

under the leadership of Keshub Chunder. This circumstance has been construed by some as a happy event, as it raised hopes of a wider propagation of the Brahmic religion; but by others it is deplored as creating a breach in, and endangering the existence of the *Samaj*. In whatever light however the case is viewed, it cannot be denied that on the principle that *"union is strength,"* and that every dissentsion tends only to weaken the parties concerned, and the object they have in view, the action of Keshub Chunder was hasty and reprehensible.

30. Rupture on the question—should persons with or without the sacred thread act as ministers and Devendranath's efforts to heal up the rupture.

The generally asserted cause of the rupture was the objection raised by Keshub Chunder to the wearing of the *poita* or sacred thread by those who conducted divine service in the Calcutta *Brahma Samaj*. At first Devendanath Thakur, who had himself renounced the wearing of the thread, was inclined to assist in the reform suggested by Keshub Chunder; and actually created Vijaya Krishna Goswami and Annadaprasad Chaterjia (two friends of Keshub), ministers of the *Samaj* in the place of the old ones, who had refused to comply with the reform. But on second thoughts, reflecting on what is due to the old ministers who had suffered much for the *Samaj*, and being desirous to retain and harmonize both conservative and progressive elements in the *Samaj*, as will be evident from the reply which he gave to a representation made to him in the subject by Keshub Chunder Sen and others, and which the reader will find a few pages further on, Devendranath Thakur withdrew his support, and the old thread-bearing Brahmas were replaced at the *Samaj*.

31. Rupture widened by an inter-caste marriage and Devendranath's views on the same.

The rupture between the two parties was further widened by Keshub Chunder solemnizing a marriage between two persons of different castes in 1863 (Saka 1786), a reform of a radical character, the adoption of which, in Devendranath's opinion, prejudicing the minds of the general Hindu community against Brahmaism would prevent the diffusion and acceptance of correct notions of the Godhead, and the consequent abolition of idolatry, a consummation which he thinks to be more devoutly wished than mere change of social institution or usage. He is not against intermarriage, but he would leave its introduction to the gradual influence of time and of Brahmaism itself, an opinion in which Keshub Chunder himself agrees in the main, as will be evident from the following extract from his speech on Social Information delivered at Bombay :

32. Keshub's support to Devendranath's view on Social Reform.

"From every true Indian my object would be, in the first instance, to extort a full and true confession of sin and a candid honest and sincere acknowledgment of the One True God as a proper object of worship, of love, and of faith. When that is done, the work of social reform may be *slow*, may come on *gently* and *quietly*; but if, without seeing the full realization of my ideas of social reformation, I were to die, simply seeing a large number of my countrymen in Bombay and Madras and Bengal standing forward manfully and boldly carrying the banners of the one True God, then, on my death-bed, I would say, with the greatest pleasure, God is glorified. *

33. Keshub removed from secretary ship and Dwijendranath Tagore appointed in his place.

Shortly after this Devendranath Thakur, perceiving that Keshub Chunder was determined to have his own way, without attending to the advice of his elders in the *Samaj*, removed him as trustee of the *Samaj* from its secretaryship. This was announced in the *Tattwabodhini Patrika* of the 15th December (1st Pous) of 1863 (S1786). Dwijendranath Thakur was subsequently appointed to the post, with Ayodhyanath Pakrasi as his assistant.

* The italics are ours.

34, Keshub's speech at sinduriapati.

After his removal from his official connection with the *Samaj*, Keshub Chunder convened a meeting on the premises of the Metropolitan College at Sindiriapati, where he delivered a long and vehement speech on the subject of religious freedom and reform.

35. The *Indian Mirror* how it changes hands.

Hitherto, notwithstanding the differences existing between the party headed by Keshub Chunder and the *Samaj*, the subject of personal interests and properties had in no way been disturbed. The *Indian Mirror*, a weekly journal at the time, still continued to be printed at the *Tattwabodhini* Press. A Brahma of the seceding party sent a letter for publication in the *Mirror*. The letter contained an attack upon the non-conforming Brahmas. This :letter became a *casus belli*. The managers of the *Samaj* objected to its publication, and disputed Keshub Chunder's right to the paper. There is no doubt that if the question of the propriety of the paper had been put to the test of the law, the paper would never have changed hands. But Devendranath Thakur was averse to taking such extreme measures, and he quiety allowed Keshub Chunder to take possession of a property to which he had not the slightest claim.

কোন্ পথ উত্তম ?

(শ্রীচারুবালা গুপ্তজায়া)

বৈদিকযুগে ঋষিরা মানুষের জীবনযাপনের জন্য সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ নামক দুইটি পথ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া জীবন যাপন করেন, এবং কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তদনুসারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া জীবনযাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাজর্ষি জনক প্রভৃতি নিষ্কাম কর্ম্মযোগী গৃহস্থ এবং শুকদেব ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

জগতের মূলে যে তত্ত্ব আছে, তাঁহার কোন নাম নাই—কোন রূপ নাই, তিনি নাম-রূপবিহীন। তিনি অতীন্দ্রিয় পদার্থ, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিনি অচিন্তনীয় এবং বাক্যমনের অগোচর। তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, একমাত্র স্বানুভূতিই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁহার মধ্যে গুণ আছে কি গুণ নাই, কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তথাপি কেহ কেহ বলেন, "তিনি নিরবয়ব এবং সগুণ" কেহ কেহ বলেন, "তিনি নিরবয়ব ও নির্গুণ." আবার কেহ কেহ বলেন, "তিনি সগুণ-নির্গুণ"। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, কেহই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিছুই বলেন নাই, সকলেই নিজ নিজ স্বানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছেন। কোন কোন :দার্শনিক বলেন, "জগতের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়।"

বেদের কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্র—সমস্ত শাস্ত্রই মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত। রচয়িতার জ্ঞানবুদ্ধি ও স্বানুভূতি অনুসারে উক্ত শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে। কোন শাস্ত্রকারই জগতের রচয়িতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কোন শাস্ত্র রচনা করেন নাই। শাস্ত্রকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাসকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ জ্ঞানভক্তিযুক্ত :নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রচয়িতা সন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অত্যন্ত উদার ও প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ। ভূমণ্ডলের সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় উহাকে প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সম্মান করেন। উহা জগতের সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থের মুকুটমণি। সাংসারিক কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের এইরূপ সুন্দর সমন্বয় পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায় না। গীতোক্ত ধর্ম্ম মহোদার এবং সমদৃষ্টিমূলক ; উহাতে দেশভেদ, কালভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদবৈষম্য নাই। উহা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজাতিতে সমান। সমত্বই উহার মূলমন্ত্র।

গীতোক্ত ধর্ম্মের সহিত নৈসর্গিক বা ঐশ্বরিক নিয়মেরও সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি নিয়মের কর্ত্তা মনুষ্য নহে, এই সমস্ত ভগবদ্‌বিহিত প্রাকৃতিক বিধান। গীতা উল্লিখিত নিয়মসমূহ লঙ্ঘন করিতে উপদেশ প্রদান না করিয়া সংযতরূপে উক্ত নিয়মসমূহ পালন করিতেই উপদেশ প্রদান করেন।

গীতা বলেন, "হে মানব! তোমরা যুক্তাহার-বিহার যুক্তকর্ম্মচেষ্টা ও যুক্তনিদ্রাজাগরণ অবলম্বন পূর্ব্বক মনে সন্ন্যাস রাখিয়া আমরণ সংসারের সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন কর। উপবাসাদি করিয়া শরীরকে কৃশ করিও না, ইহা দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্যপদার্থ ক্লিষ্ট হয়, এবং তাহাতে পাপ হয়। সংসারে থাকিয়া জ্ঞানভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম করিলেই ভগবানের উপাসনা করা হয়। তাঁহার উপাসনার জন্য সংসার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনে গিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জগৎরচয়িতা মানুষকে কর্ম্ম করিবার জন্যই কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এই ভূমণ্ডল মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করতঃ জগৎরচয়িতার পাদপদ্মে আত্মসমর্পন করিয়া আমরণ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া সংসারের সমুদয় কর্ম্ম করাই তাঁহার অভিপ্রেত ধর্ম্ম। সংসারিক কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় রোধ করতঃ সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সমুদয় মানব যদি সন্ন্যাস আশ্রয় করে তাহা হইলে শতাব্দীমধ্যে মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ধরাপৃষ্ঠ হইতে মনুষ্যজাতি উৎসন্ন হইয়া যাউক, ইহা কখনই জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। অতএব সন্ন্যাস অপেক্ষা জ্ঞানভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই জীবন যাপনের উত্তম পথ।

ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত গীতোক্ত ধর্ম্মের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সহিতও বেশ সামঞ্জস্য আছে।

পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক শুভ হয়—ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্রটি আমার বোধ হয় যেন গীতোক্ত ধর্ম্মেরই সংক্ষিপ্ত সার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূরভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতি ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইবে।

বৈদিকধর্ম্মে মানুষের জীবনযাপনের জন্য সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ নামক যে দুইটি পথ নির্দ্ধারিত আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই জীবনযাপনের সর্ব্বোত্তম পথ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের মতে ঐ উভয় পন্থার মধ্যে সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবনযাপন করিবার পরিবর্ত্তে পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ উপাসনাপূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া জীবনযাপনই শ্রেয় ও মঙ্গলের পথ।

খাসিয়া অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ওঁ

বেজুড়া।

২২।৮।৩১ ইং

ভক্তিভাজন

আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণকমলেষু

মহাত্মন্!

আপনি আমার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মগুরু। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের গতি এক প্রকার রোধ করিয়াছি। এখন আর পূর্ব্বের মত পার্ব্বত্যজাতীয় লোক খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে না। খাসিয়া পাহাড়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায়ের নেতৃত্বে এক প্রকাণ্ড দল গঠিত হইয়াছে।

খাসিয়া পাহাড়ে ক্ষিতীন্দ্রসেবাশ্রম নামকরণ করিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে। খাসিয়া পাহাড়ের একজন রাজা একটি পাহাড় আশ্রমের জন্য নিষ্কর বন্দোবস্ত দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আশ্রমের ব্যয়ের জন্য অর্থসংগ্রহেরও উদ্যোগ চলিয়াছে। এবারে অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর, এজন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে না। পশ্চাতে বিস্তারিত জানাইব।

আমি গারো, নাগা, কুকি, লুসাই প্রভৃতি শতাধিক পরিবার আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছি। পাহাড়ে প্রচার বেশ চলিয়াছে। সুরমা উপত্যকায় হাকিম, উকীল, ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোকও আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। অর্থাভাব দূর হইলে সভ্যদের তালিকা একটা ছাপাইয়া আপনার নিকট পাঠাইব। বর্ত্তমানে আমাদের এই অঞ্চলে ভয়ানক অর্থাভাব, এজন্য ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না। ধান ও পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা দরিদ্র হওয়ায় ভূম্যধিকারী, উত্তমর্ণ, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ সকলেই অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছে।

• • •

পত্রোত্তরে শ্রীপাদপদ্মের কুশল সম্বলিত আশীর্ব্বাদ পত্র প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীপ্রসন্ন কুমার মজুমদার।

গ্রন্থপরিচয়।

বন্ধু আমার।—পরম পূজনীয় ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের "বন্ধু আমার" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। ইহা পাঠ করিয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটা সুতীব্র জাগরণ আসিল। যথার্থই তিনি বন্ধুকে প্রকৃষ্টরূপে চিনিয়াছেন। মনীষি ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাই তাঁহার হৃদয়ের আবেগভরা উচ্ছ্বাসগুলি অকপটে সেই চিরবন্ধুর চরণে দিয়া প্রাণে অসীম শান্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি জগতে আসিয়া চিরসুহৃদকে জানিয়াছেন চিনিয়াছেন, তিনিই এ মরতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। এ সংসার-নাট্যশালার অভিনয়ে আসিয়া শুধুই রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় জগতের আনন্দে মুগ্ধ হইয়া আমরা সেই চিরবন্ধুকে ভুলিয়া থাকি। কিন্তু যিনি হৃদয়ের মধ্যে সেই চিরসখাকে দর্শন করিয়া ও প্রকৃষ্টরূপে সেই চিরবন্ধুকে লাভ করিয়া বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ "বন্ধু আমার" লিখিয়াছেন, এবং বন্ধুকে চিরসহচররূপে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি বন্ধুচরণে নিবেদন করিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তিনি ধন্য। আমি তাঁহার "বন্ধু আমার" পড়িতে পড়িতে সময় সময় আত্মহারা হইয়া পড়ি। বন্ধুর মধুর ডাক যেন আমারও প্রাণে সাড়া দেয়। ক্ষিতীন্দ্রবাবু যে অকপটে সেই নিত্যসখার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহার "বন্ধু আমার" পড়িলেই তাহা বোঝা যায়। যে প্রকৃত বন্ধুপ্রেম লাভ করিতে পারে নাই, তাহার এই নিগূঢ় বন্ধুপ্রীতি আসিবে কোথা হইতে? তাঁহার বন্ধুটি যে একেবারে নিখাদ খাঁটি সোনা। তাঁহার সহিত কপটতা চলে না। তাই পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "ভাবের ঘরে চুরি চলে না"। অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি লাভ করিতে গেলে নিজেকে খাঁটি বিশুদ্ধহৃদয় হইতে হইবে। তাঁহার বন্ধুর প্রতি প্রীতিভরা হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি যেমন মধুর, তেমনি সরস সরল ও প্রাঞ্জল—অনন্ত ভাবধারাসংমিলিত। তিনি সরল মনে অকপটে হৃদয়ের বন্ধুকে যে প্রাণের উচ্ছ্বাসগুলি নিবেদন করিয়াছেন, তাহা ভক্তহৃদয়ের গোপন ব্যথার অর্ঘ্য। তাঁহার এ প্রীতি-অর্ঘ্য তাঁহার চিরসখা চিরবন্ধু নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক প্রাণের উচ্ছ্বাসটী যেন ভাগীরথী-নির্ঝরের মত পুণ্য-পূত পবিত্র ধারায় মানবহৃদয়কে প্লাবিত করিয়া অশ্রান্ত কলতানে ছুটিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের এই যে গোপন বাণী তিনি নির্জ্জনে একান্তে বসিয়া ভগবচ্চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন, সেগুলি যেন পুষ্প-ধূপ-চন্দনের সৌরভে ভরা। তাঁহার এ প্রীতির আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের "বন্ধু আমার" বা ভক্তের আত্মনিবেদন আমি মস্তকে রাখিয়া ধন্য হইলাম।

—শ্রীঅম্বুবালা দেবী।

দেশবিদেশের গল্প।—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমনোরম গুহ প্রণীত। ঢাকা সন্তোষ লাইব্রেরী হইতে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১০৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৷৵০ আনা।

আঃ বাঁচিলাম! অনেকদিন পরে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার উপযুক্ত একখানি গ্রন্থ পাইলাম। পাইয়া সমালোচনা করিব, কি আনন্দের আবেগ ধরিয়া রাখিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থখানি আমি আমার নয় বৎসর-বয়স্ক দৌহিত্রকে পাঠ করিবার জন্য দিয়াছিলাম। তাহার মন্তব্য অনুসারে লিখিতেছি যে, ইহা হইতে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য—একাধারে এই তিনটী বিষয়েরই শিক্ষা পাওয়া যায়। ইহাতে অনেকগুলি ছবি দেওয়াতে ইহা ছেলেদের বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে। বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত এবং লিখনভঙ্গী সুন্দর। কেবল বালকেরা কেন, আমার ন্যায় অনেক বৃদ্ধেরাও ইহা হইতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় প্রাপ্ত হইবেন। এই প্রকার গ্রন্থ আরও অধিক প্রকাশিত হইলে এবং সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইয়া তৎসাহায্যে বালকেরা গড়িয়া উঠিলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

সংসারধর্ম্ম ও গৃহচিকিৎসা।— শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত বিদ্যাভূষণ তত্ত্বনিধি প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা; প্রাপ্তিস্থান আম্রতলা পোঃ অঃ, ছয়ঘরিয়া জেলা খুলনা।

এই গ্রন্থ পাইয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তাঁহার যে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সংসারের মঙ্গলসাধনরূপ সেই মহৎ উদ্দেশ্য যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। বলিতে কি, সংসারী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারিবেন। গ্রন্থের এগার পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্রে দেখা যায় যে, ৩৭৪টী বিষয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতেই গ্রন্থের বিষয়-বিস্তৃতি উপলব্ধি হইবে। ইহাতে দেহ মন ও আত্মার যাহাতে উন্নতি ও মঙ্গল হয়, তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যথাসম্ভব দৈহিক রোগের আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও দেশীয় চিকিৎসা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তিই এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র।—ডাঃ শ্রীফণীন্দ্র নাথ বসু এম-এ, পি-এইচ, ডি প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৩ ফর্ম্মা। প্রাপ্তিস্থান বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

আমরা যে সকল গ্রন্থ ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি, "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" সেই প্রকার গ্রন্থের অন্যতম। গ্রন্থখানি দেখিয়া এবং তাহা আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমাদের যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। আমরা জানিনা যে, এই পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি না; যদি না হইয়া থাকে তবে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এই গ্রন্থে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মাতৃভক্তি, দেশপ্রেম এবং একনিষ্ঠ সাধনার বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার অনুকরণীয়। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্দ্দিষ্ট হইলে বালক ও যুবকেরা জীবনের ও বিদ্যাশিক্ষার প্রথমাবধি ঐ সকল গুণে যে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, গ্রন্থখানি সুকুমারমতি বালকদিগের বুঝিবার উপযুক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমার সৌভাগ্যবশতঃ, এক সময়ে আমি বিজ্ঞানবিষয়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি বিশেষভাবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য সময় নষ্ট করিতেন না—অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষণে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন; তাঁহার পরীক্ষণের সাহায্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়সকল বুঝাইবার ক্ষমতা আশ্চর্য্যরূপ ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে ইংরাজ অধ্যাপকদিগের সহিত সমান বেতন না পাওয়া পর্য্যন্ত বেতন না লইয়া জগদীশচন্দ্রের যে তেজস্বিতা ও মহত্ব-প্রদর্শনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা প্রত্যেক বালকবালিকার হস্তে এই গ্রন্থের একখানি করিয়া দেখিতে পাইব, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শ্যামলী।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—A gentleman is known by his valet—একটি লোক কি রকম তাহা তাহার চাকরকে দেখিয়া বুঝা যায়। সেইরূপ একটি কবিকে তাঁহার গ্রন্থের প্রচ্ছদপট হইতে কতকটা জানা যায় মনে করি। এই গ্রন্থের নাম শ্যামলী। প্রচ্ছদপটে একটুখানির ভিতর তাহার সুন্দর একটি ছবি দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কবির ভিতরকার কবিত্বটুকু পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। গ্রন্থকার নিতান্তই তরুণ যুবক। তাঁহার তরুণ হৃদয়ের শ্যামল ভাব প্রত্যেক কবিতাতে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা মনে করি, এই তরুণ কবি এই পথে অগ্রসর হইলে সফলতা লাভ করিবেন।

আদর্শ সূচীশিল্প ১ম ভাগ।—শ্রীসুশীলা দেবী প্রণীত। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, মেসার্স চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৴৹।

এই পুস্তিকাখানিতে সাড়ী প্রভৃতির উপযোগী অনেকগুলি ফুল ও লতাপাতার চিত্রনমুনা দেওয়া হইয়াছে। এগুলি সূচীশিল্পীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা এই পুস্তকখানি সূচীশিল্পে সুনিপুণ এক মহিলাকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলাম। তিনি বলেন, যাঁহারা ছবি আঁকিতে জানেন না অথচ সূচীকর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় এবং ইহা তাঁহাদের একটী বিশেষ অভাব মোচন করিবে। তবে চিত্রগুলির মধ্যে আরও একটু বৈচিত্র্য থাকিলে ভাল হইত। ইহাতে শুধু সুতার কাজ না দিয়া দু'একখানি তারের কাজের চিত্র দিলে সুবিধা হইত। কি কি রং দিয়া সেলাই করিলে কোন্ চিত্রের কোন্ অংশ দেখিতে সুন্দর হইবে, তাহা প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে বা পার্শ্বে একটু ইঙ্গিত করিলে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটু সুবিধা হইত। ইংরাজীতে এরূপ নমুনাপুস্তক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশে বোধ হয় ইহাই প্রথম। এই সূচীশিল্প আমরা কুটীরশিল্পের অন্যতর বলিয়া মনে করি এবং এই পুস্তক এবিষয়ে সাহায্য করিবার খুবই উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মোটামুটিভাবে সূচীশিল্পের প্রণালী যথাসম্ভব সংযুক্ত করিয়া দিলে পুস্তিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন।—শ্রীযুক্ত সুখময় দাসগুপ্ত প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী, ৪৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ।৵৹ ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—স্কুল সাপ্লাই কোং, পটুয়াটুলি—ঢাকা।

গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম দুইটী কারণে। একটা কারণ হইতেছে এই যে, এইরূপ গ্রন্থের আবির্ভাবে বালক-বালিকাদিগের রুচির পরিবর্ত্তনের জন্য লেখক ও প্রকাশকদিগের সাধু ইচ্ছা ও উদ্যোগ প্রকাশ পাইতেছে; এবং দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে বুঝিতেছি যে, বালকদিগের এইরূপ গ্রন্থ পড়িতে রুচি ও আগ্রহ জন্মিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন সংক্ষেপে ও সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আমরা কবি Long fellowর সহিত একমতে বলি,—

"মহত চরিত আনে সদাই মোদের প্রাণে,
মোরাও "মহত হতে পারি।"

তবে আমাদের একটী বক্তব্য এই যে, বালক-